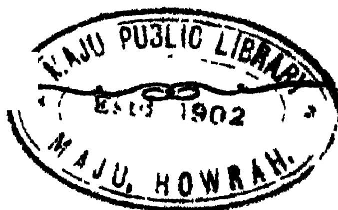
সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা—২

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।



শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।



৺ কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা হইতে
শ্রীগোপীচন্দ্র শর্ম্ম সাংখ্যতীর্থ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[illegible]ঃ ১৮৪৬

৺কাশীধাম, ভারতধর্ম্ম প্রেসে,
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বাগচী দ্বারা
মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—
৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা
সোনারপুরা চৌরাস্তা বারাণসী।
নিগমাগম পুস্তকালয়
জগৎগঞ্জ বারাণসী।

মুখবন্ধ।

—:*:—

শ্রীশ্রী৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সমাজ হিতকর গ্রন্থমালার দ্বিতীয় সংখ্যারূপে "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ" প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের মূল প্রবন্ধত্রয়ের মধ্যে প্রথমটি "সাহিত্য" পত্রের ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় এবং তৃতীয়টি ১৩২৮ সালের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "সাহিত্য" পত্রেই ঐ সকল প্রবন্ধের প্রতিবাদরূপে কতকগুলি লেখা বাহির হয়, ঐগুলির উত্তর ১৩২৮ সালের "সাহিত্যে" পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—তাহা এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত হইল। তারপর "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে একটি প্রবন্ধ ঐ পত্রে "৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" এই শিরোনামে ১৩২৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ "ব্রাহ্মণ সমাজ" ও "কায়স্থ পত্রিকা"য় বাহির হয়—সেই প্রতিবাদ দুইটির উত্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-তীর্থ ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী এই মহোদয় দ্বয় কর্ত্তৃক যথাক্রমে "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রের ১৩৩০ সালের ভাদ্র ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ব্রাহ্মণ সমাজে'র এই তিন প্রবন্ধ এতদ্ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত হইল। উত্তর হইতেই প্রতিবাদ প্রবন্ধ সমূহের প্রতিপাদ্য কথা গুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে—তাই ঐসকল প্রতিবাদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

পুনর্মুদ্রিত প্রত্যেক প্রবন্ধেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংশোধন ও সংযোজন করা হইল।

'সাহিত্যে' ও 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রে মদীয় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে বহু ব্যক্তিই আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া সমাজের হিতকল্পে

এগুলি পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দুইটি (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া "মর্য্যাদা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—ইহাতেও প্রবন্ধগুলির গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রচারে সমধিক উৎসাহ জন্মে। পরিশেষে ৺কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণসভা কর্তৃক প্রকাশভার গৃহীত হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

আমার পক্ষে "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রে প্রাগুক্ত যে দুই মহোদয় প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, অপিচ, যাঁহাদের নিকট হইতে এই সকল প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে পুনঃ প্রচারার্থ উল্লেখিতানুরূপ উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

কিরূপে এবং কি উদ্দেশ্যে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে—এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ইতি—

৪৫ নং হাউস কটরা,
৺কাশীধাম।
লক্ষ্মীপূর্ণিমা, শকাব্দাঃ ১৮৪৬।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি।

গতবারে (১৩২৬ সালে) যখন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি গৌহাটিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন একদা কথাপ্রসঙ্গে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহার সহিত যে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎভাবে আলাপ-পরিচয় ছিল, এ কথা অনেক গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছিলাম; তাই কৌতূহলী হইয়াই ঐ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—বিশেষতঃ পরমহংস তাঁহার 'চাপরাশ' আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনিও যখন ৺রামকৃষ্ণ গলনালীর পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন—তখন পীড়াযুক্ত স্থানে মন একাগ্র করিলেই পীড়া সারিয়া যাইবে, একথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; এই দুই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পরমহংস দেবের ভক্তগণের লিখিত বিবরণ হইতে বিশেষভাবে বিভিন্ন; এবং তাঁহার সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয় সামান্ততঃ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও পরমহংসের ভক্তগণের প্রচারিত গ্রন্থাদি পাঠে তৎসম্বন্ধে যেরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহা হইতে অনেক পৃথক্ রকমের বোধ হইয়াছিল।

৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—এবং একজন উচ্চদরের সাধু মহাত্মা বলিয়াই তাঁহাকে মনে করিয়া থাকি। তাঁহার ভক্তগণের রচিত জীবন-চরিত ইত্যাদি ছাড়াও অপরের লিখিত

পরমহংস-দেবসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব পোষণ করি—এমন কি হিন্দু সাধনশাস্ত্রে ও দেবদেবীতে যাঁদের বিশ্বাস আদৌ ছিল না, এমন অনেক লোককে আমি পরমহংস-দেবের উক্তি ও জীবন-চরিত পাঠ করিতে বলিয়াছি, কেহ কেহ তদ্দ্বারা ফলও পাইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই—বরং তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন, তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হউক—এই অভিপ্রায়ই এই প্রবর্ত্তনার কারণ।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখিতে পারি নাই—তাই সেদিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, আমার নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশিত করা গেল।

পরন্তু আগে পূর্ব্বপক্ষ সম্যক্ না বলিলে উত্তরপক্ষ ঠিক্ বোঝা যাইবে না। তাই রামকৃষ্ণদেবের ও পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে 'চাপরাশ' ও মনঃসংযোগ দ্বারা রোগশান্তিবিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা, ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপই এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"চাপরাশ" সম্বন্ধে কথা।

"একদা এই রঙ্গমন্দিরের সম্মুখস্থিত ভক্তিভাজন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রামকৃষ্ণদেবের আগমন হইয়াছিল। এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি গমন করেন। আমরা সকলেই পশ্চাৎগমন করিয়াছিলাম। আমাদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে "হ্যাঁগা তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, তোমার চাপরাশ আছে?" চূড়ামণি মহাশয় কোন উত্তরপ্রদান করিতে

পারিলেন না এবং আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনরায় কহিলেন, "দেখ যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন পাহারাওয়ালা আসিবামাত্র সকলে সরিয়া পড়ে। লোকের হিসাবে পাহারাওয়ালা স্বতন্ত্র কোন প্রকার জীব নহে। তবে লোকে কেন সরিয়া যায়? কেন তাহাকে ভয় করে? কেন তাহার কথা শুনে? পাহারাওয়ালা সামান্য লোক, তাহার বেতন ৩৲ টাকা, তাহাকে কেহ ভয় করে না। কিন্তু তাহার যে চাপরাশ আছে, তাহা দেখিয়া লোকে ভীত হইয়া থাকে, যেহেতু চাপরাশ মহাশক্তির পরিচায়ক। সেইরূপ ভগবানের আদেশ এবং ইচ্ছা না হইলে তাঁহার শক্তি কাহার ভিতর না প্রবিষ্ট হইলে, যে যত পণ্ডিত হউক, যে যত বহুদর্শী হউক. যে যত শাস্ত্রজ্ঞ হউক, যে যত সুবক্তা হউক, কেহ কখন লোকের মন হরণ করিতে পারে না।" ইত্যাদি * রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

মানসিক একাগ্রতা দ্বারা রোগপ্রশমনের কথা।

"শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাধির সময় ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। পরমহংসদেব সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রহস্যের কথা।" † পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৪৫ পৃষ্ঠা।

---

* এ বিষয়টি শ্রীম—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ একাদশ খণ্ডে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষতঃ) বর্ণিত আছে; তাতাতে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—শ্রীম—মহাশয় বেশ একটু মোলায়েম করিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু দুই জন "সাক্ষাৎ দ্রষ্টা"র বর্ণনায় এইরূপ পার্থক্য হওয়াটা একটু আশ্চর্য্যজনক নহে কি?

† এ কথাটাও গ্রন্থান্তরে আর এক রকমে আছে:—ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন,

এখন শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

৺সদাশিবঃ শরণং।

বহরমপুর

২৭।৯ ২৫ *

পরম স্নেহাস্পদেষু—সাম্নয় সমাবেদনমিদং—

মহাত্মন্! † অনেকদিন হয় আপনার পত্রখানি পাইয়াছি, উত্তরে অনেক কথা লিখিতে হইবে, তাদৃশ অবকাশের প্রতীক্ষায় এতদিন বিলম্ব হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মহাশয়ের (পরমহংসের) সম্বন্ধে আমি যতটা বিদিত আছি, তৎসমস্তই সংক্ষেপে জানাইতেছি। এতদ্দ্বারাই আপনার জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের উত্তর হইবে।

রামকৃষ্ণ 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা

অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে ক'রে মন একাগ্র ক'রে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এ কথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এ ভাঙ্গা হাড়মাংসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?" পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। ইত্যাদি স্বামী সারদানন্দপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ৭৪ পৃষ্ঠা।

* অর্থাৎ ২৫শে পৌষ ১৩২৭। পূর্ব্বে সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতনরীতি; পাশ্চাত্যের সঙ্গে এখানেও আমাদের প্রভেদ। (লেখক)

† তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত—এবং "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"—তাই এই ক্ষুদ্রকেও এতাদৃশ সম্বোধন করিয়াছেন।

আমি জানি না। খুব সম্ভব ইহা সাধারণ লোকের নিকটই পাইয়াছিলেন। আজকাল সাধারণ লোকেরাই ঋষি, মহর্ষি, অমুকানন্দ, অমুক স্বামী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণের পরমহংস নামও বোধ হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন, তবে তাহাও ভ্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে. কারণ শাস্ত্রমতে যেরূপ অবস্থা হইলে পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পাই নাই। এ কারণে তাঁহার প্রতি ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতে আমি সাহস পাই না. তবে তাঁহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই জন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর আশ্রমের ভাবে ধরিলে তাঁহাকে কোনও সংজ্ঞাই অকুণ্ঠিতভাবে দেওয়া যায় না। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই—দণ্ডীও ছিলেন না, তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে 'অবধূত আশ্রমী' বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলাই উচিত।

রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেকদিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথম তিনিই আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপরে আমিও তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতাম। "ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ আছে কি না" আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমি তাঁহাকে দেই নাই। সুতরাং ঐ ভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫।৩০ বৎসর

পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না; কাযেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আমি কোন ধর্ম্মতত্ব শিক্ষা বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাই নাই; কারণ তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং আধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়, বা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বা তৎপ্রাপ্তি-সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রবিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত; 'রামকৃষ্ণকথামৃত' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও কতকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং ভক্তি রাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তিশিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।

তাঁহার ভক্তিমাখা গান শুনিতে বড় ভাল লাগিত, ভক্তির ভাব দেখিতেও আনন্দ হইত। অশাস্ত্রীত তিনি কতটা উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য কুতূহল ছিল। আর তিনি অকপট সাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা ছিল।

এই সকল কারণে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতাম। আর তিনি সাধারণ লোকের নিকট হাসিতে হাসিতে যে সকল টোট্‌কা কথা বলিতেন, তাহাও বেশ মিষ্ট লাগিত। কিন্তু আমার নিকট তিনি কি কারণে সময় সময় আসিতেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে

শাস্ত্রের ২। ৪টি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা স্মরণ আছে। আর আমাকে তিনি বিশেষ একটু মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন এইরূপ আমার মনে হইত। আমি ধর্ম্মব্যাখ্যাকার্য্যে ব্রতী ছিলাম, তাহাতেও তিনি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, মমতার কারণ বোধ হয় তাহাই হইবে। তিনি আমার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।

তাঁহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা সুকঠিন. তবে বাহিরে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে একজন সাধুপ্রকৃতির লোক এবং অধ্যাত্মরাজ্যেও এই স্থূলদেহের সম্বন্ধ কাটাইয়া আন্তররাজ্যের মনোময় কোষ অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারিতেন, ইহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। অহঙ্কার, ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলিও তিনি অনেকটা দমন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি সকলকেই প্রায় সস্নেহে হাস্যমুখে কথা বলিতেন। ভোগ্যবস্তু বিষয়েও তাঁহার আসক্তি অনেকটা কমিয়াছিল, ইহা আমার ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তিনি এক শ্রেণীর অবধূত, সে অবস্থায় প্রসাদ মৎস্য মাংসাদি ভোজন তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে; কিন্তু খাইতেন কি না তাহা আমার স্মরণ নাই।

তবে রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গপূর্ব্বক স্নান এবং বারংবার পান খাওয়া দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতেই থাকিতেন, সেখানে মায়ের নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোগ হইয়া থাকে, সেই প্রসাদ খাইতেন। তৎপর তাঁহার গুণগরিমা সাধারণে প্রকাশিত হইলে, অন্যলোকেও উৎকৃষ্ট দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ী আনিয়াও অনেকে খাওয়াইত। সুতরাং আহার তাঁহার উৎকৃষ্ট মতই হইত, বাসস্থানও উৎকৃষ্টই ছিল। অতএব তাঁহার টাকাকড়ির কোন প্রয়োজনও ছিল না, তাহা নিতেনও না। এ কারণে তাঁহাকে একটি উন্নত পুরুষ অবশ্যই বলিতে হইবে। স্বয়ং পাঠ করিতে

করিতে কিংবা অক্তের গান অথবা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিলে কিছু কালের মত তাঁহার একপ্রকার সমাধির মত অবস্থা হইত, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না কিয়ৎকাল পর জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। এই সমাধির ভাব তাঁহার মনোরাজ্যে থাকিয়াই হইত, তাহার উপরে নহে কারণ তিনি ঈশ্বরের রূপগুণেই মগ্ন থাকিতেন, তাহার উপরে নহে। রূপানুভূতি মনোরাজ্যেই হইয়া থাকে, ইহা অধ্যাত্মবিদ্যার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তাহার পর যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য প্রকার স্তর আছে, সমাধিরও অসংখ্য অবস্থা আছে, আর সর্ব্বোপরি যে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব বস্তু আছে,—যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না। সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ্ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরু উপদেশে তাহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না, কাজেই তিনি স্থূলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়াছিলাম।

তাঁহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই; গানাদি শ্রবণমাত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে। আবার কিছুকাল পর হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্দ্বারা এই সমাধিকে ঠিক্ অনুষ্ঠানের ফলও বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অধিক দুর্ব্বল থাকে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ের সামান্ত ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতররূপে জানাতেই, তখন অবস্থাবিশেষে কাহারও বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইয়াও থাকে। গানাদি শ্রবণেও ইহা

দেখা গিয়াছে। হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম, তাহার ৫।৬ বৎসর বয়স হইতেই খোল করতালসহ কীর্ত্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহ্য সংজ্ঞার অভাব হইত, ১০।২৫ পল বা অর্দ্ধ দণ্ড পর আবার সে প্রকৃতিস্থ হইত, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া গেল। তখন সে অতি কুপাত্র হইয়াছিল। ৫ বৎসরের সময় ইহার অবস্থা দেখিয়া নব্য অবতারের আবিষ্কারকগণ ইহাকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অজ্ঞের মহিমা অপার! আমার একজন শিষ্য দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরূপ অবস্থা হইত, এখন তাহা সারিয়া গিয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের মস্তিষ্কের অবস্থাও অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল। কোন কুলোক বা সুলোকে তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, কিংবা কোন পানভোজন করিতে দিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের শক্তি যেটুকু সংক্রান্ত হইত, তাহাও তাঁহার অনুভবে আসিত। স্বর্ণাদি ধাতব বস্তু স্পর্শেও তিনি বিশেষত্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল থাকার অন্যান্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। সেই কারণেই গান করা বা শুনাকালে তাঁহার ঐরূপ বাহ্য সংজ্ঞা বিলোপ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। অজ্ঞান অবস্থায় যে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিতেন, সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল বলিয়া মনে হয়। সমাধিশাস্ত্রে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে ঐরূপ অবস্থায় যে তাঁহার মনোময় কোষে সমাধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অমূলক। তবে তিনি বিজনে বসিয়া কতদূর কি করিতে পারিতেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কোষে যাইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় নাই। তিনি দেহত্যাগ

করার পূর্ব্বে মাস ৫।৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দারুণ যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "আমি একাগ্রতার চেষ্টা করিলে ইষ্ট দেবতার দিকেই লক্ষ্য বাড়ে, সুতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না।" তাহা হইলেও তিনি, যোগ-শক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন, একটি সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোনও বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িয়া-ছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আত্মীয়ভাবে আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আপনার প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, আপনি অবশ্যই তাহা বলিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে, প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে; ইহা সত্য কিনা তাহাই জানিতে বাসনা, নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, আপনিতো ঠিক্ ধরিয়াছেন। আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন, আমি তো সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি? আমি বলিলাম, অন্য কিছু কারণ থাকিলে, আমার অবিদিত; আপনি কুসংসর্গের আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি। তিনি বলিলেন, ইহা তো আপনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন, আমি ইহা বেশ অনুভব

করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি। * * * † উহারা যে আমায়ে ছাড়ে না। এখন আমি উহাদের খপ্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানের কোন উপায় নাই। কাজেই এবার এই ভাবেই যাইবে। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার গলরোগ, তৎপরে দেহাবসান হয়।

তাঁহার যোগজ কোনও বিভূতি আমি দেখি নাই; তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক শক্তির কার্য্য নহে, নৈয়াসিক শক্তির কার্য্য; ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে।

ইহার উপদেশের দ্বারায় কলিকাতা অঞ্চলে অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিল। যাহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত, তাহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মকর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কৃত মতের পরিবর্ত্তন ইহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, এ উপকার হিন্দুসমাজের চিরস্মরণীয়। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই মাত্র যথাজ্ঞান আপনাকে বিদিত করিলাম। আপনি ইচ্ছা করিলে, ইহা যে কোনরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। এই পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ সহ আপনার কুশলবার্ত্তার অভিলাষ করি। অত্র মঙ্গল ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীশশধর শর্ম্মণঃ।

পণ্ডিত প্রবর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ দেবকে "পরমহংস" লক্ষণাক্রান্ত না দেখিয়া তাঁহাকে 'অবধূত' বলিয়াছেন; 'অবধূত' যে 'পরমহংস' অপেক্ষা কম কিছু, আহা মনে করা অনুচিত—'অবধূতঃ

† বোধ হয় কোনও কোনও ব্যক্তির নাম হইবে। চূড়ামণি মহাশয় তাহাদের উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই।

শিবঃ সাক্ষাৎ অবধূতঃ সদাশিবঃ'—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কি হইতে পারে ?

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কোন্নগরনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺ রামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর লক্ষণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কি আমার নমস্য ?" (৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—") ৬২পৃষ্ঠা।

তারপর ৺ রামকৃষ্ণের ভাবাবেশসম্বন্ধেও তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে: কেন না তিনি সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ মধ্যে মধ্যে অচেতন হইতেন। ৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে আছে, "ঠাকুর-দেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন।" (৪ পৃষ্ঠা)

অতএব এইরূপ ভাবাবেশ যোগজাত সমাধি নহে বলিয়াই বোধ

---

* কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাতে ৺ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত পণ্ডিতপ্রবরকে তীব্র আক্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ওরূপ ভাব ঠিক্ নহে। মনে রাখা উচিত, কেহই 'অন্তর্য্যামী' নহে—বাহ্য আকার আচরণ দেখিয়াই লোকে অপরকে বিচার করিবে—বিশেষতঃ শাস্ত্রদর্শীরা শাস্ত্রের কষ্টিপাথরেই লোককে কষিয়া দেখিয়া তদ্বিষয়ে ধারণা করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। [সম্প্রতি ৺তারকেশ্বরের মহন্তসম্বন্ধীয় আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার পণ্ডিতবর্গ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বিষয়ে যে শাস্ত্রবাক্য উদাহৃত করিয়াছেন তাহাতে আছে—

দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥

৺রামকৃষ্ণদেবে এ সকল লক্ষণ কতটা লক্ষিত হইত ?]

হয় *—ইহার অধিক বলিতে আমার অধিকার নাই—তবে ধর্ম্মসাধনে অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্য্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা যে প্রণিপাতযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষাবস্থায় পরমহংসদেবের 'কু-সংসর্গ' সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত আমরা ৺ রামচন্দ্র দত্ত-কৃত জীবনবৃত্তান্তে পাইয়াছি।—"তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।" (১৫৪ পৃষ্ঠা) †

মোটের উপর চূড়ামণি মহাশয় ৺ রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অনুকূল ভাবই পোষণ করিয়াছেন,—তবে তাঁহার ভক্তগণ যে সকল শাক্তমত্তা তাঁহার উপর আরোপ করেন—সে গুলি চূড়ামণি মহাশয় অনেকটাই স্বীকার করেন না। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। অধিক শ্রদ্ধাসহকারেই ৺ রামকৃষ্ণ দেবের নিকটে যাইতেন। তাঁহার কথাগুলি, সুতরাং সমাদরযোগ্য। বিশেষতঃ শাস্ত্র ও দেব-দেবীতে যখন বিশ্বাস হারাইয়া হিন্দুসমাজ বিধ্বস্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল—তখন যেমন ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদর্শে ও উপদেশে সমাজের উপকার হইয়াছিল—পণ্ডিত শশধরের ধর্ম্মবক্তৃতার দ্বারা তাদৃশ—এমন কি তদপেক্ষা অধিক—উপকার হইয়াছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য কর্তৃক প্রচারিত ও তৎকর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত "বেদব্যাস" পত্রে "সাধুদর্শন" শীর্ষক কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত

* ব্রাহ্মপ্রচারক ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "পীড়া" বলিয়াছেন। তদীয় আত্মচরিতে আছে "তদ্ভিন্ন তাঁহার (অর্থাৎ পরমহংসের) একটি পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিতেন।" (২০৮ পৃষ্ঠা) [ইহা "নার্ভাস্‌নেস্‌" বলিয়াই বোধ হয়।]

† কৌতূহলী পাঠক "জীবনবৃত্তান্তে"র এই প্রসঙ্গটি সমগ্র পড়িয়া দেখিবেন।

হইয়াছিল—তাহাতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী *প্রভৃতির সঙ্গে ৺ রামকৃষ্ণেরও প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় সর্ব্বদাই ৺ রামকৃষ্ণ দেবকে আদরের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেন।

৺ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার যেটুকু ভক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি—অবশ্য তাঁহার ন্যায় সাধু মহাত্মার সম্বন্ধে কথা বলায় আমি নিতান্তই অনধিকারী। তথাপি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

শ্রীশ্রীভগবতীর ইচ্ছায় জগতের সমস্তই হইতেছে—এই যে রামকৃষ্ণ দেবের বঙ্গদেশের রাজধানীর সন্নিকটে আবির্ভাব, তাহাও তাঁহার একটা বিধান। সনাতন ধর্ম্মের যখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা—সাকার উপাসনার—তথা ধর্ম্মসাধনের সনাতন রীতির প্রতি যখন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের অনাস্থা হইতেছিল, তখন অনেকগুলি বিষয় মহামায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী

---

* এ স্থলে অপর একজন অতিবিশিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়ের কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না; পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই, তৎসময়ে পূর্ব্বদিন আমার জনৈক পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺———মহোদয়ের সহিত ৺রামকৃষ্ণপরমহংস সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "বাপু হে, লোকটি বেশ চতুর ছিলেন, কিন্তু তুমি যে বল, তিনি ভগবতীর দর্শন পাইয়াছিলেন, এ সব বাজে কথা—এমন যে পূর্ণানন্দ পরমহংস—তিনিও সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কেননা তাঁহার গ্রন্থে "এটাও হইতে পারে, ওটাও হইতে পারে," এরূপ সন্দেহ আছে, যাঁর ভগবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁর সন্দেহ থাকিবে কেন?" উত্তরে বলিয়াছিলাম—"মহাশয়, যে দেবতাকে এমন ব্যাকুলভাবে ডাকিলে বা ঈদৃশ কঠোর তপস্যা করিলেও দর্শন করা যায় না, এমন দেবতা আমি মানি না—পূর্ণানন্দের যে স্থলে সন্দেহ বলিতেছেন, তাহা যদি এমন হয় যে, এটা ওটা উভয়টাতেই ঈপ্সিত বিষয় সমানভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে, তাহ'লে?" পণ্ডিতমহাশয় এই অজ্ঞকে হঠাৎ প্রাজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতে দেখিয়াই বোধ হয় "মৌনমত্র হি শোভনম্" মনে করিয়া আর তর্ক বাড়ান নাই।

কৃপায় সংঘটিত হইয়াছিল—৺ রামকৃষ্ণ দেবের অভ্যুদয়ও তাহার মধ্যে একটি। তাঁহার উক্তি ইত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়া আমার প্রতীতি এই জন্মিয়াছে যে, তিনি শাস্ত্রানুসারে সাধন ভজনাদি করিয়া যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রায়শঃ শাস্ত্রের বিধিরই অনুযায়ী—এবং সনাতন ধর্ম্মেরই পোষক। তাঁহার কথায় ও আদর্শে অনেকের স্বধর্ম্মে আস্থা হইয়াছে—ইহাতে সনাতনধর্ম্মের উপকার হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সনাতন রীতি নীতির বিরুদ্ধে নানা উপদেশ প্রচার করিয়াছেন—এবং রামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়. রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে 'অবতার' সাজাইয়াছেন—তাঁহারা অপর সাধু মহাত্মগণের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, 'অবতার' না হইয়াও তাঁহাদের বর্ণনানুরূপ (যাহাতে বহু কথা অতিরঞ্জিত আছে) মনুষ্য ভারতবর্ষে অনেকেই ছিলেন। ৺ ত্রৈলিঙ্গস্বামী ৺ ভাস্করানন্দ স্বামী, বারদীর ব্রহ্মচারী, বামাক্ষেপা, ৺ রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি বহু মহাত্মা ভারতের নানাস্থানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া শিষ্য ও ভক্তগণকে চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণের যাঁহারা মন্ত্রশিষ্য—তাঁহাদের গুরুদেবকে ভগবান্ মনে করা খুবই সঙ্গত—কিন্তু 'অবতার' বলিয়া প্রচার করাতে এই অনিষ্ট হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু 'অবতারের' আবির্ভাব হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভট্‌শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অবতারবাদীরা শ্রীচৈতন্যের অনুকরণে রামকৃষ্ণের 'লীলা' প্রচার করিতেছেন—ইহাতে শ্রীচৈতন্যেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হইতেছে। *

* চৈতন্যভাগবতাদি পড়িয়া অনেক ব্যক্তির ধারণা হইয়াছিল, মহাপ্রভু

তারপর ৺ বিবেকানন্দ 'হাঁড়িধর্ম্ম' 'ছুৎমার্গ' ইত্যাদি বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, জানিনা, আজ ৺ রামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকিলে তিনি শুনিয়া কি বলিতেন ; লোকে যা'তা' খাউক, যার তার পাত চাটুক —এরূপ উপদেশ তাঁহার উক্তি বা আচরণে কোথাও পাইয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না। ৺ রামচন্দ্র দত্ত-চরিত "জীবনবৃত্তান্তে" আছে— "তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন। (১৩২ পৃষ্ঠা) ফলতঃ সাধু মহাত্মারা শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন রীতি নীতির বিরুদ্ধে চলিবার জন্য উপদেশ দিবেন—বা তদনুরূপ আচরণ করিবেন, ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে। * বরং অবস্থাভেদে সাধারণের আচার আচরণ হইতে উদাসীন অবধূত কোনও সাধু বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান করিলেও তাহা গর্হিত হইত না—তথাপি ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ওরূপ কিছু করিয়াছেন বলিয়া তো দেখা যায় না। বরং তিনি বলিতেন, "আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি—ওরা দৌড়িয়ে মুতিবে!" তাই নিজের আচরণের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেন। †

সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে ৺ বিবেকানন্দ যে সকল কথা বলিয়াছেন—এবং তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে ইতোধিক কিছু বলা এস্থলে অনুচিত মনে করিতেছি—ইচ্ছা আছে প্রবন্ধান্তরে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

একজন অবতারই হইবেন—তাই জন্মাষ্টমীর ন্যায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের এ সকল জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহার মনে হইল—যাহা ইদানীং ঘটিতেছে—৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ তাহাই হইয়াছিল—অর্থাৎ ভক্তেরা অত্যুক্তিপূর্ণ কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি এখন আর ঐ তিথিতে উপবাস করেন না।

* শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলীতেও এমন দেখা যায় না যে, চৈতন্যদেব "সবলোট" হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পুরীতে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই—তথাপি সেখানেও তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিন্ন ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। অথচ তিনি সন্ন্যাসী সুতরাং বর্ণভেদের অতীত ছিলেন।

† অবশ্য, রামকৃষ্ণ কথামৃতে বা লীলাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের আচরণে বা বাক্যে শাস্ত্র ও সদাচার বিরোধী ভাব দেখা যায় ; এসম্বন্ধে ইতঃপশ্চাৎ আলোচনা দ্রষ্টব্য হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আসামে বিবেকানন্দ।*

আজ (১৩২১) ঠিক্ ২০ বৎসর হইল, স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে সদলবলে আগমন করেন; এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ৺কামাখ্যা দর্শনার্থে শিলং যান এবং তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ দু-এক দিন এখানে থাকেন। তখন গৌহাটিতে সেন্সাস্ আফিস ছিল—সেই আফিসে কাজ করিতাম তাই বিবেকানন্দের দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল—শিলং যাওয়া-আসা উভয় কালেই তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

১৩০৭ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ এবং দু-একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন—তাঁহার জননীও না কি ৺কাঁমাখ্যা দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবস্থানের নিমিত্ত একটি

---

* 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্ত যখন ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র কয়েকখানি পাঠাই, তখন ৺সুরেশ সমাজপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, ঈদৃশ আরো চিঠিপত্র আছে কি না? উত্তরে লিখি, যে সকল চিঠি আছে, তাহার লেখকগণ সৌভাগ্যক্রমে জীবিত—তবে ৺স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি আসিলে তাঁহার সঙ্গে যে সকল আলাপ আলোচনা হয়, তাহা লিপি-বদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থে পাঠাইতে পারি—কিন্তু সে সব স্বর্গীয় স্বামীজির তেমন গৌরবজনক না হইবার কথা—বিশেষতঃ আমি তাঁহার 'ভক্ত'ও নহি। ইহার উত্তরে সুরেশ বাবু লিখিয়াছিলেন, '* * * আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। সে যাহা হউক প্রবন্ধটি পাঠাইবেন। পাঠাইলে আমার অভিপ্রায় আপনায় জানাইব। * * *' প্রবন্ধ 'সাহিত্যে' প্রেরিত হইল; কিন্তু হায় সুরেশবাবুর অভিপ্রায় হইতে ইহা বঞ্চিত হইল।

(লেখক)

সুবৃহৎ 'বাঙ্গলো' ঘর দেওয়া হয়—এবং গৌহাটির সর্ব্বসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের ব্যয় প্রদান করা হয়।

বিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে জনৈক ভদ্রলোক সহ আমি ঐ বাঙ্গলো ঘরে যাঁই। বারান্দার একখানি টুলের উপর একটি গৌরবর্ণ 'গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি পরা' লোক একাকী বসিয়া আছেন—চুলগুলি এলোমেলো, পান চিবাইয়া ঠোঁট লাল হইয়াছে; দেখিয়া মনে করিলাম, ইনি বোধ হয় স্বামীজির কোনও "চেলা" হইবেন। ইহার পূর্ব্বে স্বামীজির ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বড় বড় দুইটি চোখ ছাড়া এই মূর্ত্তির সঙ্গে, ছবি দেখিয়া যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই।* সে যাহা হউক, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম—'স্বামীজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—দেখা হইবে কি?' ইনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'তা, আপনাদের কি কথা আছে বলুন।' † তখন বুঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্গী ভদ্রলোকটি আমার পরিচয় দিলেন। তখন নানা রূপ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল.

কথায় কথায় উঠিল—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার কথা।

---

* এখানে একটি অবান্তর কথা বলিতেছি। যতদূর স্মরণ হয়, স্বামীজির কপালে একটা দাগ—কাটার চিহ্ন—যেন দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার ছবিতে এরূপ কোনও দাগ দেখা যায় না। তাঁহার জীবনচরিতেও এই দাগের কথা আছে (স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু কৃত ২৮ পৃষ্ঠা)। তবে ছবিতে দাগটা থাকা কি ভক্তগণের অনভিপ্রেত বলিয়াই ইহা নাই? চরিতাখ্যানেও কি এরূপ হস্তাবলেপ ঘটিয়াছে?

† এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, এতদিন পরে স্মরণ করিয়া লেখাতে অনেক কথাই লিখিত পারা গেল না—যাহা লিখিত হইল, তাহাতেও ঠিক এইরূপ ভাষাতেই উক্তি প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না। তবে 'মর্ম্ম' এইরূপই ছিল, এটুকু বলিতে পারি। দিন-তারিখ হয়ত ঠিক না হইতে পারে, কেন না আমার কোনও 'ডায়েরি' নাই।

স্বামীজি বলিলেন, "বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে এদেশে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম, "কেন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে কত উৎকৃষ্ট সৌধ প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।" তিনি বলিলেন—"ও সব অত্যুক্তিপরিপূর্ণ বর্ণনা।" তার পর প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—"এই যে আপনার গলায় পৈতা, এটাও পারসীকদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম "সে কি, উপবীত শোধনের যে বেদমন্ত্র আছে—তাতে 'যজ্ঞোপবীত' শব্দটিও তো স্পষ্ট রহিয়াছে!" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, ঐ মন্ত্রটা পড়ুন তো?" পড়িলাম, "যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং" ইত্যাদি। তখন বলিলেন, "দেখুন, এ মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত; ইহার শব্দ ও ছন্দঃ আধুনিক।" আমি একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে স্বামীজি, আপনাতে আর দয়ানন্দে * কোনও প্রভেদ দেখিতেছি না; এরূপ অবস্থায় কোনও তর্ক চলিতে পারে না।" ফলতঃ ঐরূপ আলোচনার ঐখানেই বাধা পড়িল—আর কোনওরূপ 'তর্ক বিতর্ক' তাঁহার সঙ্গে আমার হয় নাই।

অতঃপর আরও কিছুকাল কথাবার্ত্তা হইল—অবশেষে জানা গেল স্বামীজি পরদিন সংক্রান্তিতে (খুব সম্ভব) কামাখ্যা দর্শন করিবেন এবং তৎপরদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবেন।

সঙ্গী ভদ্রলোকটীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা কয়েকজন মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বশিষ্ঠাশ্রমে গেলাম। আশা ছিল, স্বামীজি সদলবলে সেখানে যাইবেন—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইবার যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল—কোনও কারণে তিনি সেদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে পারেন নাই। ক্ষুণ্ণমনে শহরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, স্বামীজির বক্তৃতা হইতেছে। দ্রুতগতিতে বক্তৃতার জায়গায় গিয়া দেখি, লোকারণ্য,

* পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

এই ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া তখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম ইতঃপূর্ব্বে সভায় পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) ধীরেশ্বরাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে না কি স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল ; সকলেই তাঁহার সংস্কৃত আলাপে দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি যখন গিয়া জনতার পশ্চাদ্ভাগে কথমপি দাঁড়াইতে সমর্থ হইলাম, তখন সভা নিস্তব্ধ—স্বামীজি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দিবেন না, বসিয়াই দু'চারি কথা বলিবেন। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, "একটা প্রসঙ্গ তুলুন—কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, তদবলম্বনে কিছু বলিতে পারি।" কিন্তু সমবেত জনগণের মধ্যে কেহই অগ্রসর হইয়া কোনও প্রশ্ন করিতেছেন না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই ভট্টচার্জ্জি কোথায় ?" একজন, "ভট্‌চাজ"র সঙ্গে স্বামীজির সেই দিনের তর্কবিতর্কের কথা বোধ হয় শুনিয়াছিলেন, তাই, বুঝিতে পারিয়া উত্তর দিলেন—"উনি বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছেন।" তখন কিন্তু খোদ "ভট্টচার্জ্জি" জনতার অন্তরালে—সাড়া দিবার অবস্থায় না থাকাতে চুপ করিয়াই রহিয়াছিলেন। সে যাহা হউক—এই প্রশ্নোত্তরে সভার নীরবতা ভঙ্গ হইল—তাই অপর একজন ঐ সময়ে বলিলেন,—"জাতি-বিচার উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলুন।"

তদুত্তরে স্বামীজি যাহা বলিলেন, তাহাতে জাতিভেদের উপকারিতা প্রথমতঃ প্রদর্শন করিলেন ; অবশেষে ইহার সঙ্গে যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার জড়িত রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে বহু বলিলেন। সেই সময়েই দুইটি কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনি ; (১) 'হাঁড়িধর্ম্ম,' (২) 'ছুঁৎমার্গ'। তখন, "খুলিল বাক্যের দ্বার না লাগে কপাট"—'জাতিবিচার' ছাড়িয়া নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। এই জাতিটা একটা জড়পদার্থ, সেই জড়ের সময় হইতে একই ভাবে চলিয়াছে—'দেখামাত্রমপি ক্ষুধাদাবনো-

বন্ধনঃ পরম্। ন কাতীয়ঃ প্রভাঃ'—এটা কি ভাল? এইরূপ জড়তায় দেশ উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে—বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কিছু কর—না হয় বড় দরের একটা চুরি ডাকাতি কর—তবুও বুদ্ধি খুলুক, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা বলিলেন। তাঁহার সেইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা বহুল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতা অথবা অপর যে সকল বক্তৃতা পড়িতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, ইনি একজন বেদান্তবাদী ধর্ম্মপ্রচারক। কিন্তু ঐ দিনকার বক্তৃতায় বুঝিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচার একটা 'খোলস' মাত্র—ভিতরে স্বতন্ত্র ভাব। জাতিটা তাঁহার মতে নিদ্রিত—এটা জাগিয়া উঠুক—উঠিয়া একটা নাড়া-চাড়া দিউক; খাদ্যাখাদ্য বিচার ইত্যাদিতে তাঁহার মতে সমগ্র জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দিতেছে না, সেটা উঠিয়া যাউক, ইত্যাদি। প্রকৃত ধর্ম্মবক্তা জাতিটার উপর একটা মোহের আবরণ দেখিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন বটে—কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা আছে, তাহা দূর করিয়া দাও, "না হয় একটা বড় দরের চুরি ডাকাতি করিয়া বুদ্ধি খোল" এইরূপ উপদেশ কখনও দেন না।

অতঃপর স্বামীজির শিলং যাত্রার পূর্ব্বে আবার দুই দিন বক্তৃতা হয়। সেই দুই বক্তৃতা ইংরেজীতে নিয়মমত বিজ্ঞাপন দ্বারা বিষয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়। প্রথম দিন জনৈক বাঙ্গালী প্রবীণ উকীল সভাপতি হন—অপর দিন আসাম ভ্যালি ডিভিশনের কমিশনর মিঃ এ, পোর্টিয়াস্ বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। একদিন বিষয় ছিল "Transmigration of the Soul" এটা খুবই স্মরণ আছে; কিন্তু অপর দিনের বক্তৃতার বিষয়টি ঠিক স্মরণ নাই; তাহাতে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য ছিল, ইহাদ্বারা অনুমান হয়—"Vedanta in Indian life" এইরূপ একটা বিষয় ছিল।*

* এই অনুমানের একটা কারণ আছে। স্বামীজির বক্তৃতা লইয়া

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জিনিসই বটে। কি সুমিষ্ট আওয়াজ, কি সুন্দর আবৃত্তি—কি সুষ্ঠু শব্দযোজনা। বিশেষতঃ প্রথম দিন যাঁহাকে দেখিয়া 'বিবেকানন্দ' বলিয়া ধরিতে পারি নাই—তাঁহার সেই পাগড়ী, সেই আলখেল্লা দেখিয়া মনে হইল, "হাঁ৷ ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁর ছবি পূর্ব্বে দেখিয়াছি।" তাঁহার বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলা, যেন যাত্রার দলের অধিকারী। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্রদ্বয়, সস্মিত সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল * এও এক দেখিবার জিনিস। ফলতঃ আজ বিশ বৎসর পরেও যেন সেই মূর্ত্তি চোখে ভাসিতেছে—সেই কণ্ঠস্বর কাণে বাজিতেছে। সাধে কি আমেরিকা ক্ষেপিয়াছিল ?

এই দুই বক্তৃতার দিন অনেক সাহেব বিবি সভায় হইয়া স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালির দ্বারা হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অতঃপর স্বামীজি শিলং চলিয়া যান। † সেখানেও তাঁহার অবস্থান ও অভ্যর্থনার জন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন। সেখানে একদিন মাত্র বক্তৃতা হইয়াছিল। তারপর শ্বাসকাশে অভিভূত

উকীলদের বৈঠকখানায় আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে নাকি কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'বক্তৃতায় নূতন কিছুই নাই—পূর্ব্বে প্রদত্ত বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে—মুখস্থ শক্তি খুব অদ্ভূতই বটে।' মাদ্রাজের নটেশান প্রকাশিত স্বামীজির বক্তৃতাবলীর ঐ বিষয়ক বক্তৃতাতেই 'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকের উল্লেখ ও তরজমা আছে।

* শুনিয়াছি, চেহারার চাক্‌চিক্য বিধানার্থ নাকি স্বামীজি গ্লিসেরিন্ ব্যবহার করিতেন।

† স্বামীজির শিলং যাওয়ার কয়েক মাস পরেই আমিও সেন্‌সাসের কাজে শিলং গিয়াছিলাম—এবং তত্রত্য বন্ধুবর্গের প্রমুখাৎ তাঁহার কাহিনী শুনিয়াছিলাম—তাই যথাশ্রুত দু'একটি কথা লিখিতে পারিলাম।

হইয়া পড়াতে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই, বৈঠকী আলোচনা অবশ্যই হইয়াছিল। লোকপ্রিয় শাসনকর্ত্তা (স্যার) হেন্‌রী কটন চিফ্ কমিশনর ছিলেন। তিনি স্বামীজির খুব তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি সভায়ও যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলে, স্বামীজি বক্তৃতারম্ভে বলিলেন;—"তীর্থস্থান পরিভ্রমণই সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য, তাই কামাখ্যা হইয়া শিলঙে আসিয়াছি। এস্থানেও হেন্‌রী কটনের ন্যায় সাধু পুরুষ রহিয়াছেন—তাই ইহাও একটি তীর্থ—তীর্থীকুর্ব্বন্তি সাধবঃ।" ইত্যাদি। শিলং শহরে পাঁঠা খুব শস্তা, আহার্য্য বস্তুর মধ্যে মাংসসম্ভারই সমধিক থাকিত—একদিন তাহাতে কিছু ত্রুটি ঘটাতে সজীয়া না কি ক্রোধ প্রকাশও করিয়াছিলেন। শিলং হইতে ফিরিবার কালে বোতলে বোতলে "সুরুয়া" পাথেয়স্বরূপ আনীত হইয়াছিল। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ জনৈক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবমতাবলম্বী ভদ্রলোকের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি একটা অশ্লীল কথা বলাতে, * শিলঙে অনেকেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। নদীয়া ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামিবংশীয় জনৈক অত্যুচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিবেকানন্দ অভ্যর্থনার চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া পশ্চাত্তাপগ্রস্ত হইয়া একদিন না কি উপবাসও করিয়াছিলেন।

শিলং হইতে ফিরিয়া স্বামীজী গৌহাটিতে দুই চারিদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ

---

* সেই ভদ্রলোকটি এবিষয়ে যাহা (সম্প্রতি) লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল:—'* * * কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি "নামরূপ মিথ্যা" বলিয়া উঠিলেন। আমি তাহা শুনিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "যদি তাহাই হয় তবে, 'নিত্যলীলার' অর্থ কি?" এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'ঐ নিত্যলিঙ্গ আর ঐ নিত্যযোনি কি, তাহা আমি জানি না।' বলাবাহুল্য, ঐ বিষম কটূক্তি শুনিয়া আমি ও আমার সঙ্গে সঙ্গে * * * দাদা প্রভৃতি অনেকেই মর্ম্মাহত হইলেন। * * * উত্তর দিবার জন্য যখন আমি উদ্যত, তখন * * দাদা আমাকে লইয়া তাঁহার বাসায় গেলেন। * * *"

করিয়াছিলাম। একটি 'রুমে' তিনি ও আমি নির্জ্জনে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলাম—তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত আন্তরিক ভাবেই আলাপ করিয়াছিলেন। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজি, শুনিয়াছি যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার জন্মে—এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপর অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কি?" তিনি উত্তরে মাত্র বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বলুন, বলুন।" আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই—কিন্তু মনে মনে যাহা ভাবিলাম—তাহা (যখন স্বামীজিকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন) এস্থলেও না বলাই সঙ্গত।

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার আমেরিকার কাজের বিষয় উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন—'সেখানে এমন করিয়ে' আসিয়াছি যে, এখন যে কেহ গিয়া ক'রেকর্ম্মে বেশ থাক্‌তে পারবে, মধৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেব'। থিয়সফিষ্টদের কথা উঠিল; আমি একটু প্রশংসাই করিলাম—"এঁরা সেই আমাদেরই শাস্ত্রের বহু কথা প্রচার করিতেছেন।" উত্তরে স্বামীজি যেন একটু উত্তেজিতভাবেই বলিলেন,—"সাহেবেরা আমাদের উপরে সব বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, আবার ধর্ম্মবিষয়েও আসিয়া গুরুগিরি করিবে, এটা আমি সহিতে পারি না।" * আমার জীবনের এক

---

* এই কথাটি আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল—১৯১১ অব্দে ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মেলনে যখন শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে একত্র কয়েকদিন অবস্থান করি, তখন একদিন তাঁহার কাছে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, এবং 'বিবেকানন্দ ঠিকই বলিয়াছেন' এরূপও বলিয়াছিলাম। হীরেন্দ্র বাবু স্বয়ং থিয়সফিষ্ট দলের একজন নেতৃস্বরূপ। তিনি বলিয়াছিলেন—'সাহেবেরা গুরু হইবে কেন? তাঁহাদেরও তো নেতা আমাদেরই 'মহাত্মগণ।' "আমি বলিলাম, মহাত্মারা এদেশে কি লোক পাইলেন না যে, অলকট্ ব্লাভাট্‌স্কির স্কন্ধে ভর করিলেন?" উত্তরে বোধ হয় তিনি এই বলিয়াছিলেন—"সমগ্র জগদ্ব্যাপী কাজ করিবার সমর্থ লোক আমাদের দেশে কোথায়? এঁদের দ্বারা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সমগ্র জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইতেছে।

উদ্দেশ্য ছিল—বেদান্ত দ্বারা ভবের জয় করা বহু সাহেব বিবি দ্বারা পা টেপাইয়াছি।" কথায় কথায় তাঁহার 'চিকাগো' বক্তৃতার সম্বন্ধে আলাপ হইল। বলিলাম, "স্বামীজি, আপনার গুরুদেব ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস তো প্রতিমা অর্চনা করিয়াই চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আপনি তা'হলে চিকাগো বক্তৃতায় কিরূপে একথা বলিলেন, From high soaring flights of Vedanta philosophy to vulgar ideal of idolatry? মূর্ত্তি পূজাটা কি 'Vulgar'?" স্বামীজি বলিলেন, 'আমি ও 'Vulgar' বলিয়াছিলাম?' আমি বলিলাম আমার তো যেন তাই মনে হয়।' তিনি বলিলেন "তা'হলে 'Vulgus=people, Vulgar অর্থ 'popular' এই আমি 'মীন্' করিয়াছিলাম " আমি বলিলাম 'তা হ'লে 'Vulgar' না বলিয়া সোজাসুজি 'popular' বলিলেই তো পারিতেন?" অতঃপর এ বিষয় আর কথা চলে নাই।*

আরও বহু কথা হইল—সব স্মরণও নাই—দু-একটা কথা (উপরে উল্লেখিত ছাড়া) মনে আছে তাহা নানা কারণে প্রকাশযোগ্য নহে। তবে পূর্ব্বের বৈঠকী বক্তৃতা শুনিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, এই আলাপের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। মনে হইল যে, "এই সন্ন্যাসীর সাজপরা লোকটি যেন মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত একটী কেশরী !

আলাপাবসানে বিদায় গ্রহণের সময় তিনি 'ব্রহ্ম নভেল' দুএকখানি পাঠাইয়া দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; তদর্থে কমিশনার

আমাদের দেশের অনেকেও এঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশ্বাসের আধিক্যবশতঃ উপকৃত হইতেছেন।"

* সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে হইল যে, আমার স্মৃত্যনুসারেই আমি তাঁহার বক্তৃতার ঐ বাক্যাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইদানীং প্রকাশিত তাঁহার ঐ বক্তৃতার কথাটি এ ভাবে আছে "From the high spiritual flights of Vedantic Philosophy * * * the low ideas of idolatry." শব্দটা 'low' আছে, 'vulgar' নহে। এই 'low'টা স্বামীজি কিরূপে বুঝাইতেন, জানিনা।

পোর্টিয়স্ সাহেব নিকটে চিঠি দিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা পাঠাইয়াছিলেন কি না ইত্যাদির খবর আর নেহ নাই। একজন সন্ন্যাসীর 'ফ্রেঞ্চ নভেল' পাঠের স্পৃহাটা আমার কাছে তত ভাল ঠেকে নাই।

আসামে স্বামী বিবেকানন্দের পরিভ্রমণস্মৃতি আমাদের পক্ষ হইতে বিবৃত করা হইল। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের স্মৃতিও এ স্থলে আলোচনা-যোগ্য মনে করিতেছি।

বেলুড় মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গল্প করিয়াছিলেন। * * * কামাখ্যায় তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুনলুম তিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুনলুম তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর' দেব আর শঙ্করাচার্য্য একই লোক কিনা বুঝতে পারিলাম না। তবে লোক-গুলিকে দেখিয়া বোধ হইল ত্যাগী—সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়বিশেষ" *

যাঁহারা জাতসার, তাঁহারা এইটুকু পড়িয়া স্বামীজির গবেষণার প্রসার দর্শনে স্তম্ভিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক মহাত্মা শঙ্কর দেবের নামটি 'হঙ্কর' দেব এই তুচ্ছভাবে উল্লেখ করা কতদূর সমীচীন, তাহাও বিবেচ্য। কোথায় কায়স্থ বৈষ্ণব গৃহস্থ শঙ্করদেব, আর কোথায় ব্রাহ্মণ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য। জানি না তিনি কার কাছে শঙ্করদেবের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং কাহাদের দেখিয়া "ত্যাগী" বোধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের এবং আক্ষেপের বিষয় যে, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ আসাম অঞ্চলের এই সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানকল্পে

* শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড ১০২৪—২৫ পৃষ্ঠা।

কোনও প্রযত্ন করেন নাই; তাহা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে তাঁহারই জাতীয় একজন মহাপুরুষ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই কামরূপ অঞ্চলে কি এক প্রবল ধর্ম্মান্দোলন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ বঙ্গদেশে আপামর সাধারণের হিতার্থে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন বঙ্গসাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে, এই মহাত্মাও তাদৃশ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পার্ব্বত্য জাতীয়েরাও আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে আসিতেছে—আসামীভাষা তাঁহারই স্বরচিত কীর্ত্তন ভাওনা (নাটক) প্রভৃতির দ্বারা পরিপোষিত হইয়াছে। *

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বে তাঁহার গুরু ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে ইঁহার পূর্ব্বজন্মের বহু তপস্যা সঞ্চিত ছিল। বাল্যাবধিই ভগবদ্বিষয়ে তাঁহার একটা প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। বিশেষতঃ "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা, শুচিশীলা সাধ্বী মাতা, প্রাক্তন পুণ্যফলেই লাভ করিয়াছিলেন। গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—ভক্তিসহকারে তদীয় পূজার্চ্চা হইত। সাধু সন্ন্যাসীর একটা

---

* যাঁহারা শঙ্করদেবসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে সমুৎসুক, তাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত শ্রীযুত উমেশচন্দ্র দেব-প্রণীত 'শঙ্কর দেব' গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

আড্ডা ও—তাঁহার বাড়ীর নিকটে জনৈক ভক্ত গৃহস্থের অতিথিশালায় ছিল—তিনি ঐ স্থানে গিয়া সতত সাধুসঙ্গ করিতেন। লেখা পড়া না শিখিলেও স্মরণশক্তি দেখা যায় বেশ ছিল—সাধুদের মুখে যে সকল শাস্ত্রকথা * ও যাত্রা ইত্যাদিতে যে সব গান শুনিয়াছেন, তত্তাবৎ যথেষ্ট মনে রাখিয়াছিলেন।

তারপর ভাগ্যক্রমে ভ্রাতার সঙ্গে ৺কালীমন্দিরের সেবার সহকারী হইলেন। প্রাণটি প্রাক্তন সুকৃতিবশতঃ সরল ছিল—লেখাপড়ার—বিশেষতঃ এ যুগের পাশ্চাত্যগন্ধি শিক্ষার দ্বারা চিত্তবৃত্তি বিকৃত হয় নাই। তাই অনন্যমনা হইয়া জগদম্বার অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছিলেন। ফল শীঘ্রই ফলিল—ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা আসিল। শ্রীভগবানে চিত্তের প্রগাঢ় অভিনিবেশ হইলে যাহা হয়, তাহা আমরা ধ্রুবচরিত্রে দেখিতে পাই। এখানেও সাধনপথের প্রদর্শক গুরু, উত্তরসাধক 'তোতাপুরী' 'ব্রাহ্মণী'—ইত্যাদি জুটিতে লাগিলেন সাধনার সনাতনপদ্ধতিতে কাজ করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিলেন, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম-সাধনের উপায়গুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল। যখন সাকারোপাসনা ও সনাতন সাধনপথ অসার বলিয়া খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসের অভ্যুদয় সমাজের কল্যাণার্থেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার অহর্নিশ অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে মনোনিবেশ, ভগবদ্বিষয়িণী কথা ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গে পরাঙ্মুখতা, কামিনী ও কাঞ্চনে অনাসক্তি, বালকের ন্যায়

---

* রামকৃষ্ণ। * * * আমি মূর্খোত্তম।

একজন ভক্ত। তা হ'লে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—তা ছাড়া আরো কত কি—বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে (কামার পুকুরে) সাধুরা যা পড়তো বুঝতে পারতাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ—৯২ পৃষ্ঠা।

সরলতা, ইত্যাদি অনন্যসাধারণ অবস্থা দেখিয়া হিন্দুর ত কথাই নাই, যাঁহারা সনাতনপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন—অনেকে পুনশ্চ এ পথে ফিরিয়া আসিলেন।

রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতেও নানা সাধু সন্ন্যাসী সজ্জনের সমাগম হইত; তাঁহাদের কাছ হইতেও নানাতত্ত্ব তিনি জ্ঞাত হইতেন। এইরূপ বাল্যে ও সাধনাবস্থায় সাধুসঙ্গ এবং গুরু ও উত্তর সাধকের নিকট হইতে তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞান আহরণপূর্ব্বক নিজের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতাদ্বারা ঐগুলি আয়ত্ত করিয়া সরল ভাষায় যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা অতি অমূল্য জিনিস—এ সকল দ্বারাও হিন্দুসাধারণের অতিশয় উপকার সাধিত হইয়াছে।

তাঁহার কাছে আসিয়া যাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এমনও দু'একজন ছিলেন, যাঁহারা ঈদৃশ অপর কোন সাধু মহাত্মা দেখেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে অবতার বলিয়া খ্যাপিত করিতে লাগিলেন। ৺রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। এতদ্দ্বারা রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনিষ্ট সাধিত হইল। বালকের ন্যায় সরলস্বভাব পরমহংস অনবরত এই "অবতার" ভাবে সংস্তিত হইয়া পরিশেষে নিজেকে যেন তাহাই মনে করিতেন—শেষ অবস্থার যে সকল কথোপকথন "কথামৃত" প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইতে (ভক্তের অত্যুক্তিবাদ বর্জ্জন করিলেও) আমরা যেন তাহাই দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীজগদম্বার একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত ও সাধক রামকৃষ্ণদেব বার বছর আন্দাজ অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা এই "অবতার" সাজাতে ক্রত ক্ষয়িত হইতে লাগিল—পরিশেষে তিনি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সংবৎসরকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

কেবল যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট হইল এমন নহে, তাঁহার সাধনার জীবন যে সদ্দৃষ্টান্ত সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিল—শেষে, কতকটা

'অবতার' বলিয়াই হউক, বা পীড়াগ্রস্ত বলিয়াই হউক, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজীবনের সেই আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারেন নাই—ইহাতে সন্ন্যাস বা অবধূত আশ্রমের সমুন্নত ভাবের কিছুটা খর্ব্ব হইল; তাহাতে সমাজেরও কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইল।* তবে এটা বরং অতি সামান্য, কিন্তু এই 'অবতার'বাদের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া কতস্থানে যে কত 'অবতার' দেখা দিতে লাগিলেন এবং কত উদ্ভট আচরণ ও উপদেশ দ্বারা যে সমাজের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের কোনও অবতার বিশেষের কথা সাবশেষ অবগত আছেন, তাঁহাদের অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পরন্তু পরমহংস রামকৃষ্ণের 'অবতারবাদ'টা প্রথমতঃ তেমন জমাট বাঁধে নাই। ভক্ত-রামচন্দ্র-কৃত জীবনচরিত অথবা অক্ষয়কুমার সেন-রচিত কাব্যে অবতারবাদের কথা থাকিলেও সাধারণে ঐ কথা শিষ্যের গুরুস্তুতি মাত্র মনে করিয়াছিল। এই অবতার-বাদের অবতারণা দেখিয়াই বোধ হয়, রামচন্দ্রদত্ত-কৃত জীবনচরিতখানি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন ছাপাইবার জন্য নিয়াও তাহা প্রকাশিত করিতে নিরস্ত হন।

কিন্তু যখন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্ম-সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়া হঠাৎ লোকসমক্ষে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন, তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ অবাধে মনের সাধে গুরুর মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও তখন নানা কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল।

এতক্ষণে আমরা আমাদের প্রবন্ধের নায়কের নিকটে উপস্থিত হইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ একজন অতি বড় লোক। অকস্মাৎ

* যথা, স্ত্রীর সেবা গ্রহণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ। * * আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয় * *। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৪র্থ ভাগ ৯০ পৃষ্ঠা।

হইলেও যখন আমরা তাঁহার প্রথম বার্ত্তা পাইলাম—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিলাম—তথনই বুঝিলাম, এ ব্যক্তি যে-সে লোক নহেন। অদম্য সাহস, দৃঢ় অধ্যবসায়, ইংরেজী ভাষায় অসামান্য অধিকার, জগতের ধর্ম্মমতগুলিতে অভিজ্ঞতা, বিশিষ্ট বাগ্মিতা, ইত্যাদি এই একই ব্যাপারে সূচিত হইয়া পড়িল। বিশাল চীন সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়া ক্ষুদ্র জাপান যেমন সহসা আমাদের নিকটে এক পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—বিবেকানন্দও—যে পাশ্চাত্য ভূভাগ হইতে মিশনারীরা আসিয়া এদেশের সনাতন ধর্ম্মের নিন্দাবাদপূর্ব্বক খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন—সেই পাশ্চাত্য দেশে গিয়া সমস্ত সভ্যজগতের নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সমবেত ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়া বিজয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া আমাদের নিকটে এক অতি মহান্ পুরুষসিংহ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল—নানাদিগ্দেশ হইতে তাঁহার নিকটে অভিনন্দনপত্র প্রেরিত হইল। তারপর জাপান যেমন রুষিয়াকে পরাভূত করিয়া সমধিক গৌরবান্বিত হইল—বিবেকানন্দও যখন আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার—তথা অনেক শ্বেতকায় নরনারীর গুরুরূপে পূজা লাভ—করিয়া বরেণ্য হইলেন তখন এ দেশের লোক তাঁহাকে সমধিক আদরের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষের যে যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সর্ব্বত্রই রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভে আপ্যায়িত হইলেন। জাপানের গৌরবে যেমন সমগ্র এশিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে—বিবেকানন্দের বিজয়লাভে তেমনি ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সমুদয় হিন্দু গৌরবানুভব করিয়াছে। তারপর জাপান সম্বন্ধে যাহা, বিবেকানন্দসম্বন্ধেও তাহাই—অন্ততঃ সনাতনধর্ম্মবিশ্বাসীর কাছে—ঘটিয়াছে। জাপানের গৌরবে আমরা যতই স্ফীতবক্ষ হই না কেন—এখন দেখা গেল এটা এক পাশ্চাত্যের একান্ত অনুকরণে গঠিত—প্রাচ্য

আধ্যাত্মিকতা-বিবর্জ্জিত—চাক্‌চিক্যময় সভ্যতা, পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ভগবানই জানেন; জাপানীরা আপনাদের স্বার্থমাত্র ষোলআনা বুঝে—এশিয়াবাসীরা উঠিয়া দাঁড়াক্, এমন কল্পনা আপাততঃ উঁহাদের মধ্যে মোটেই দেখা যাইতেছে না। এই যুদ্ধের সময় যে সকল মাল জাপান ভারতবর্ষে চালাইয়াছে—তাহাতেই এরা কতদূর প্রবঞ্চক দেখা গিয়াছে এবং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি।

প্রোজ্জ্বল ময়ূখমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের বিম্বে আপাতদৃষ্টিতে রশ্মিচ্ছটা ব্যতিরেকে অপর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না—পরন্তু কোনও ক্রমে কিরণমালা অপসৃত হইলে যেমন তাহাতে উৎপাতসূচক ভীষণ কৃষ্ণগহ্বররাজি লক্ষিত হয়—সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যদিগ্বিজয় করিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ক্রমশঃ যখন তাহা হইতে বিজয়শ্রীর আবরণ সরিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম, তখন তাঁহার ভিতরকার ভাব আমরা অনেকটা ধরিতে পারিলাম, বুঝিলাম সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর লগুড়াঘাতই যেন ইঁহার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়। কথাটা ক্রমশঃ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ ধরা যাউক, বিবেকানন্দের সন্ন্যাসগ্রহণ।* অর্থাৎ তিনি যে নামে † নিজেকে জগদ্বিখ্যাত

* প্রসঙ্গতঃ একদিন স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলাপ হয়—(বৈশাখ ১৩২৩; হাওড়ার শঙ্কর মঠের শ্রীযুক্ত পরমানন্দপুরী মহারাজও সেখানে ছিলেন)। স্যার গুরুদাস বলিয়াছেন, যে যখন বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন কেহ কেহ [স্যার গুরুদাস নাম বলিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা খুব স্পষ্টরূপে মনে না থাকায় উল্লেখ করিলাম না] আসিয়া তাঁহাকে বিবেকানন্দের অভিনন্দন-সভায় সভাপতিত্বের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন "আপনারা যদি 'স্বামী বিবেকানন্দ' না বলিয়া 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দেন, তা হ'লে আমি সভাপতি হইতে পারি।" যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাব গতিক বুঝিয়া সরিয়া পড়েন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা সতর্ক সাবধান—তাঁহারা পূর্ব্বাবধিই বিবেকানন্দের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

† এই নাম সম্বন্ধেও বেশ রহস্য আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এম-এ, বি-এল, প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" (২য় খণ্ড—সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায়) আছে—"তাঁহার

করিয়াছেন—সেই নামের তিনি কতটা অধিকারী। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সন্ন্যাসে দীক্ষালাভ করেন। সেই দীক্ষার ইতিহাসটুকু এই—

"এই সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রাদি কয়েকজন যুবক ভক্তকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? তাঁহারা তাঁহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ পল্লীমধ্যে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তিনি এতদ্দর্শনে বুঝিলেন—তাঁহারা প্রকৃতই বৈরাগ্যবান্ ও নিরহঙ্কার, এবং অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বহস্তে গেরুয়া প্রদান ও সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।"

(শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু—কৃত "স্বামী বিবেকানন্দ" ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ।)

'এই সময়ে' অর্থাৎ মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে যখন পরমহংস ক্যান্সার রোগে পীড়িত হইয়া কাশীপুর বাগানে অবস্থিত; তিনি তখন 'অবতার'। সুতরাং তাঁহার কার্য্যের উপর কার কি বলিবার সাধ্য! পরন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা 'অবতারত্বে' আস্থাবান্ নহি—অপিচ ঈদৃশ উদ্ভট অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। বিবেকানন্দ কায়স্থ-সন্তান; কায়স্থেরা শূদ্র—'সৎশূদ্র'; ইদানীং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার—

যে বিবেকানন্দ নাম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গুরুভাইয়েরা কেহ জানিতেন না—কারণ স্বামীজি আমেরিকা যাত্রায় অব্যবহিত পূর্ব্বে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জন্য অনেকবার নিজনাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কখনও নিজকে 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ' কখনও বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন। অবশেষে খেতড়ীর রাজার একান্ত অনুরোধে 'বিবেকানন্দ' নামই বজায় রাখিয়াছিলেন।" ইহাদ্বারা যেন বোধ হয় 'বিবেকানন্দ' এই নাম রামকৃষ্ণপ্রদত্ত নহে। অপিচ ইহা হইতে বিবেকানন্দের প্রকৃতিরও অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই দাবি কতটা বিচারসহ বলিতে পারি না। * বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পরেই উপনয়নের বাড়াবাড়ি হইয়াছে—কিন্তু স্বধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান্ অতি কম কায়স্থই ঐ দলভুক্ত হইয়াছেন। † সে যাহা হউক, উপনয়নাদি সংস্কার নাই, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নাই, তথাপি 'সন্ন্যাস' ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেলেন! 'অধিকারী' 'অনধিকারী' বিচার, 'সন্ন্যাস' দীক্ষার শাস্ত্রানুযায়ী পদ্ধতি ইত্যাদির কথা নাই তুলিলাম। রামকৃষ্ণ একদিন ভিক্ষাটা দেখিয়াই 'বৈরাগ্যবান্' 'নিরহঙ্কার' স্থির করিয়া ফেলিলেন! কিন্তু তিনি তো স্বয়ং নিজনাম রামকৃষ্ণ পরিত্যাগ করেন নাই—কেন না ইহাতে 'অভিমান' হয়। (রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—৩য় সংস্করণ ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বিবেকানন্দ, 'স্বামীজি' সাজিয়া গেরুয়া পরিয়া রাজরাজড়ার মাথায় পা দেওয়া তো অল্প কথা, ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত শিষ্য করিয়া, তাঁহার দ্বারা পদসেবা করাইয়াছেন। (দৃষ্টান্ত 'স্বামিশিষ্য সংবাদ' প্রণেতা)। ‡

---

* সিষ্টার নিবেদিতার লিখিত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে: ‡‡ "বর্ত্তমান বাঙ্গালী কায়স্থেরা যে প্রাক্ মৌর্য্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর, এ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।" (স্বামী বিবেকানন্দ ৮৩৭ পৃঃ) অপিচ কোন মিত্র-গৃহিণী স্বীয় পত্রে 'দাসী' লেখায় আপত্তি করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষত্রিয়া বলিয়া 'দেবী' লিখিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। (স্বামীজির পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪পৃষ্ঠা।)

† মণিপুরী, কাছাড়ী, কোচ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অনেক জাতিই "উপবীত-ধারী" ক্ষত্রিয় সাজিয়াছে—ইহাতে 'ক্ষত্রিয়ত্ব' থাপনপুর্ব্বক উপবীত গ্রহণ তেমন গৌরবজনকও রহে নাই। বুদ্ধিমান্ কায়স্থগণ অবশ্যই এইটুকু বুঝিয়াছেন।

‡ এই বিষয়ে তিনি তাঁহার কোনও ভক্ত আমেরিকান স্ত্রীলোককে লিখিয়াছেন—"আর প্রিয়ম—এই পা দু'খানা বোধ হয় শ'খানেক রাজবংশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধোয়ান মুছান হইয়াছে ও পূজা পাইয়াছে" (স্বামী বিবেকানন্দ চতুর্থ ভাগ ৭৪৩ পৃষ্ঠা)। "একদা আহারাদির পর শরৎবাবু (শিষ্য চক্রবর্ত্তী) তাঁহার (গুরু স্বামীজির) পদসেবা করিতেছিলেন।" ঐ ৯০০ পৃষ্ঠা [ভবিষ্যতে এই 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ 'ব্বিঃ' অক্ষর দ্বারা সূচিত হইবে।]

তারপর জাতিভেদটা যে একটা কাল্পনিক, এটা কেবল মুখেই বলিয়াছেন, তাহা নহে, যদৃচ্ছাক্রমে যাকে তাকে উপনয়ন প্রদানপূর্ব্বক 'দ্বিজ' বানাইয়াছেন। নীলাম্বর বাবুর বাগানে শিষ্যদ্বারা অনেকগুলি পৈতার যোগাড় করিয়া বলিলেন—"* * * আজ ঠাকুরের (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের) জন্ম দিন। যে সব ভক্ত আজ এখানে আসবে, তাদের সকলকেই আজ পৈতে পরিয়ে দিতে হবে। দ্বিজাতি মাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারের অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। এরা সব ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত-সংস্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। * * *" তারপর এ ভাবে পৈতা পরা হইলে, বলিলেন—"কালে দেশের সকলকেই ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই।" ইত্যাদি (বিঃ ৮০৪—৫ পৃষ্ঠা) আর ব্রাহ্মণদের প্রতি স্বামীজির কি অগাধ প্রেম! তাঁহার অভিধানে ব্রাহ্মণ শব্দ "দুষ্ট পুরুত" দ্বারা অভিহিত। স্বামীজি এই 'দুষ্ট পুরুত'দের সম্বন্ধে বলিতেছেন "এস মানুষ হও। প্রথমে 'দুষ্টপুরুত'গুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুনবে না—তাদের হৃদয় শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস মানুষ হও।"* মান্দ্রাজী বন্ধুদের নিকটে লিখিত ইংরেজী পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ (পত্রাবলী নং ৩—প্রথম ভাগ ১৬ পৃষ্ঠা)

* বিবেকানন্দের এই ব্রাহ্মণদ্বেষ তদীয় অনুচরাদির হৃদয়ে কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে, তাহার উদাহরণ দিতেছি। "উপাসনা" পত্রিকায় একজন "[illegible] ব্রাহ্মণ" নামক কবিতা এ ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন—(১৩২১ চৈত্র) "ওরে রে ব্রাহ্মণ তোমা শোন্ এই প্রলয়ের শেষ জলোচ্ছ্বাস!" তৎপরে [illegible] দিকে যাচ্ছে—

"ভুষ্ট পুরুত"গুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে।" ঐ নং (৮) মাদ্রাজী শিষ্যের নিকট লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ—৪৯ পৃষ্ঠা।

"আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে।" ইত্যাদি মাদ্রাজীদের প্রতি। ঐ নং ১১—৬৪ পৃঃ। অলমতিবিস্তরেণ।

এই গেল ব্রাহ্মণের প্রতি পেটের ভাব। * ক্ষত্রিয়ের প্রতি ভাব অন্যরূপ, বোধ হয় তাঁহার 'স্বজাতি' বলিয়া! পূর্ব্বোক্ত ৮নং পত্রেই

"পদাঘাত বাক্যজ্বালা আজ তোর কিরীটের কনকভূষণ।" ইত্যাদি; এই 'পদাঘাত ও বাক্যজ্বালা'র প্রমাণার্থেই বোধ হয় "ঐ পত্রেই (১৩২৭—মাঘ-সংখ্যায় 'দুঃখের দায়ে" ইতিশীর্ষক একটা গল্পে) নিরীহ ব্রাহ্মণ পোষ্টমাষ্টারের উপর পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দ্বারা 'পদাঘাত' দেওয়াইয়া বলান হইয়াছে "এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।" [এই উপাসনার সম্পাদক একজন ব্রাহ্মণ এবং স্বত্বাধিকারী একজন অতি নিষ্ঠাবান্ দেবদ্বিজসেবী ভক্ত বৈষ্ণব!]

* আমি 'পেটের ভাব' এজন্য বলিলাম যে, এই সকল উক্তি চিঠির মধ্যে লিখিত কথা;—বিবেকানন্দ তো ভাবেন নাই যে, এগুলি প্রকাশিত হইয়া "গুমর ফাঁক" করিবে। প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহের ভাবও আছে—মাদ্রাজেই কোন এক সভায় বক্তৃবিশেষ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে শিক্ষাদান প্রথার দোষ প্রদর্শন করিলে স্বামীজি বলেন—"এই প্রথার ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তা সম্পত্তির রক্ষকস্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন"। বিঃ ৬৭৩ পৃষ্ঠা। অপিচ, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে স্বামীজি যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে আন্তর্জাতিক

আছে—"* * ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক্, আর নাই খাক্, তারাই হিন্দুধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস দেখ্‌তে পাচ্চ, তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, তাঁরা জাতিনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখিয়াছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঞে শুনে নাও। গীতার মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী সকল জাতি, সকল বর্ণের অধিকার দিয়াছেন, আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত কর্‌বার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিতঅর্থ কর্‌ছেন।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ নং ৪—৫০ পৃষ্ঠা) আবার সিষ্টার নিবেদিতা-প্রণীত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে, তিনি "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইতেন, ভারতের ইতিহাস কেবলমাত্র এই দুই জাতির সংঘর্ষের দৃশ্য, আর বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। * * * ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার স্রোত বলিয়া চিত্রিত করিতেন—একটি চিরপ্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও প্রাচীন আদর্শের গভীর খাতে ধীর সন্তর্পণ গতিতে প্রবাহিত। অপরটি ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত বিশ্বব্যাপী উদারদৃষ্টি লইয়া যুগযুগান্তরের

বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন প্রধান কল্প হইলেও "তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা গ্লানি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ তাঁহারাই এই বিদ্যাকে (অর্থাৎ সংস্কৃত বিদ্যাকে) রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এক্ষণে ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব থাকিত না।" বিঃ ৭৯৭-৮ পৃষ্ঠা। তবে ইহাও বক্তব্য যে, বিবেকানন্দের মতের স্থিরতা খুব কমই ছিল। ঈদৃশ অসামঞ্জস্য পশ্চাৎ ভূরিশঃ প্রদর্শিত হইবে।

লৌহনিগড় ভগ্ন করিতে উদ্যত এবং সামাজিক বিধানের প্রস্তরস্তূপকে অপসৃত করিয়া তাহার স্থলে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক। তিনি বলিতেন—এটি একটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ধারা যে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ব্রাহ্মণের অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য ব্রাহ্মণত্বের প্রবল প্রতাপের প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্যই জাত্যভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট্ মুদ্গরহস্তে 'ক্ষত্রিয়দিগের উদ্ভাবিত' বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়। বিঃ ৮৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা।

বিবেকানন্দের এই সকল উক্তি তত্ত্বজ্ঞ পাঠক হয়ত "বিবেকান্ধত্ব মূঢ়তা" মনে করিয়া 'হাসিয়া উড়াইয়া' দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি এতদুপলক্ষে দু'চারটি কথা আলোচনাচ্ছলে না বলিয়া পারি না—ইনি লোকচক্ষে কিরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কতকটা দেখান সঙ্গত মনে করিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মে যা কিছু মহৎ ও সুন্দর—তন্মধ্যে বুদ্ধকে এবং জৈনদের তীর্থঙ্করদিগকে আনিয়াছেন; এরা কি প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু'? এরা তো 'বেদ' না মানাতেই হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের বহির্ভূত।*

ব্রাহ্মণত্বের প্রভাবের উপর মুদ্গরাঘাত করিবার জন্যই যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়, তখন স্বামীজির মতে 'বুদ্ধ' অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মের 'মহৎ ও সুন্দর'রূপে পরিগণিত হইবেনই! কিন্তু এই বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যে ভারতের অধঃপতন—এটাও স্বামীজিই বলিয়াছেন—

* "বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মাংস ভোজনের প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে * * * আর এটাও ঠিক্ যে আমিষ-

---

* অথচ স্বামীজি প্যারিস নগরীতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"বেদই হিন্দু ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিভূমি!" (বিঃ ৯৬০ পৃষ্ঠা।)

ভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তি সামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে।" ইত্যাদি (বিঃ ৩৩২ পৃ) *

"উপনিষদ্ লিখিয়াছিল কাহারা ?" এই প্রশ্নের সঙ্গে যে সকল ব্যাপার জড়িত হইয়া পড়ে (যথা বেদের অপৌরুষেয়তা) ইত্যাদি তাহা না-ই ধরিলাম। কিন্তু তিনি যে মনে করিতেছেন—এটা ক্ষত্রিয়দেরই প্রচারিত বিদ্যা—এ বিষয়েরই আলোচনা করিব। কোনও কোনও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ শিক্ষা করিয়াছেন—এরূপ কাহিনী উপনিষদে আছে। পরন্তু তদ্বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার বেদান্ত 'লেক্‌চারে' কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। পঞ্চাল দেশের রাজা প্রবাহণের নিকট হইতে কিরূপে আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই গল্পটি বিবৃত করিয়া পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহোদয় বলেন, "বৈদিক আখ্যায়িকার কিন্তু যাথার্থ্য নাই। অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য আখ্যায়িকাগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেও কেবল পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা এই মাত্র প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেননা ঐ প্রশ্নাবলী ও তাহার উত্তরে (রাজা প্রবাহণ কর্ত্তৃক) পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা নহে। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণেরা জানিতেন এবং উপদেশ করিতেন। ভূরি ভূরি আখ্যায়িকাতে ইহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না।"

* আমরা স্বামীজির নিজের কথায়ই নিজের প্রতিবাদ প্রদর্শনার্থ ইহা উদ্ধৃত করিলাম। এইরূপ অসঙ্গতি আরও দেখান যাইবে। আমরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতের অধঃপতন অন্য কারণে হইয়াছে মনে করি এবং সেটা সনাতন ধর্ম্মের শ্রীহীনতা—যেমন এই যুগেও ঘটিতেছে।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপের লেক্‌চার—২য় বর্ষ প্রথম লেক্‌চার ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

অতঃপর রাম ও কৃষ্ণের কথা। * শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠের নিকটে কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—যোগবাশিষ্ঠই প্রমাণ; হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনি কর্ত্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হন, এ কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র কোনও দিন ব্রাহ্মণবিরোধী তো হন-ই নাই। বরং অব্রহ্মণ্য কিঞ্চিৎ দমনার্থ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নামগ্রহণে স্বামীজির সাবধান হওয়াই উচিত ছিল—আজ রাম-রাজত্ব থাকিলে সর্ব্বাদৌ স্বামীজিই (সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত, অন্ততঃ) দণ্ডকারণ্যের শূদ্র-মুনির দশাপ্রাপ্ত হইতেন! ধর্ম্মময় মহাক্রমের মূলরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ পরিকল্পিত;—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সেবা ভিন্ন তদ্বিরোধি কোনও কিছু কদাপি করিয়াছেন—এমন তো পুরাণেতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না। স্বামীজি ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতার বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন; ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' আছে—'অথ' এবং 'অতঃ' এর অর্থ স্মরণ করিয়া স্বামীজি অসুবিধা বোধ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার 'বেদ্‌না'ই যে মাটি হইয়া যায়! আর গীতায় কি সর্ব্ববর্ণের সমান ব্যবস্থা আছে? বরং ক্ষণিক বৈরাগ্যে মুহ্যমান হইয়া অর্জ্জুন তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায় তাঁহাকে ভগবান্ বারংবার তিরস্কার করিয়াছেন—এবং বহু জ্ঞানের কথা উপদেশ করিয়া "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" এই সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমরে নিয়োজিত করিয়া-

* শ্রীভগবান্ রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ রূপে ক্ষত্রিয়বংশেজাত হইয়াছিলেন বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘার কারণ হয়—তবে সর্ব্বাদৌ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ শ্লাঘ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বামন পরশুরাম ও ভবিষ্যকল্কির কথাও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। তবে শেষের দু'জনের কথা ক্ষত্রিয়মন্ত ম্লেচ্ছকল্প ব্যক্তির হৃৎকম্পকরী হইবারই সম্ভব!

ছিলেন, এই তো গীতার শিক্ষা। * গীতায় কদাপি "সকলকে সকল রকম অধিকার" দেওয়া হয় নাই। এই গীতায়ই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ' সেই ব্যাসদেব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজি ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে পার্থক্যের আরোপ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে?

তারপর খাদ্যাখাদ্য-বিচার—স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার সনাতন ধর্ম্মের আচারানুষ্ঠানের একটা মস্ত বিষয়—বিবেকানন্দ এটার প্রতি এত চটা যে তিনি 'হাঁড়িধর্ম্ম' 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়া ইহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। এবিষয়ে শৈশবাবধিই তিনি স্বাধীন মতের পরিপোষক—ছেলে বেলায়ই মোসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইতেন, মোসলমানের হুকায় মুখ দিতেন—তাঁহার পিতাও যেন খাদ্যাখাদ্যবিচার কম করিতেন (বিঃ ২৭ পৃষ্ঠা)। বিবেকানন্দ যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন (বিঃ ১০২ পৃষ্ঠা) এবং কিয়ৎকাল পরে পরমহংসদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যতির বেশ অবলম্বন করিলেও তিনি আহারবিষয়ে 'সবলোট' ছিলেন। মেথরের ক'ল্কে নিয়েতামাক খাওয়া (বিঃ ১৮৭পৃষ্ঠা) হইতে মুচির প্রস্তুত রুটি খাওয়া (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) এমন কি কয়েকদিন এক মেথর পরিবারে বাসকরা (বিঃ ৩৫৩ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। আর খাদ্য বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, মৎস্য মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে, তিনি, পূর্ব্বে যে গোমাংস পর্য্যন্ত ঋষিরা ভক্ষণ করিতেন, সে কথাটুকু না বলিয়া ছাড়িতেন না। (বিঃ ৩১২ পৃঃ ও ১০১১ পৃঃ)

* দুই হাজার বছর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস কর্ত্তৃক পরিকল্পিত এক অশিক্ষিত মৎস্যজীবী নিজের 'বেবসা' সমর্থন করিতে গিয়া গীতার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিয়াছিল—"সহজে কিল জে বিনিন্দিএ ণহু সে কম্ম বিবজ্জণীয়ে" (সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ—গীতা)। ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে স্ব স্ব জাতিগত আচার পালনেই ভারতের আপামর সাধারণ আবহমান কাল হইতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া আশ মিটাইয়া নির্ব্বিবাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন; অতএব ইহার নিকট হইতে আমরা খাদ্যাখাদ্য-স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচারের আর কি সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি?

বিবেকানন্দ তো গীতার প্রশংসাবাদী ছিলেন—সেই গীতায় সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ আহার বিচার রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায়ও তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় লোক নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত জর্জ্জকুম্-লিখিত গ্রন্থের অনুসরণে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে" আহারের বিচার করিয়া গিয়াছেন। সাহেবদের মধ্যেও নিরামিষাশী অনেক আছেন। ফল কথা খাদ্যাখাদ্য বিচার একটা সকল সমাজেই দেখা যায়। বিবেকানন্দের যেমন দস্তুর—এ বিষয়েও বিপরীত কথা অর্থাৎ খাদ্য বিচারের কথা—তাঁহার উপদেশমধ্যে দেখিতে পাই। পঞ্জাব ও রাজপুতানায় ভ্রমণকালে তিনি শিষ্য ও সঙ্গীদিগকে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান্ হইতে এবং আমিষ আহার বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আঠার ও বারো বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ পুরুষ হওয়া যায়।" (বিঃ ১৯৬ পৃষ্ঠা)। যে সে লোকের হাতে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ অর্থাৎ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আচরণ দ্বারাও যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়। "ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস্ জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস্ জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি এ জল স্পর্শ করিয়াছিল।" কথামৃত ১ম ভাগ ১৪২ পৃষ্ঠা। * এই যে স্পর্শদ্বারা শক্তিসঞ্চার বা রোগমুক্তি, যাতে

* এইরূপ কথা আরও আছে—"অনেক সময় পরমহংস দেব যাহার তাহার হাতে জল খাইতেন না বা যাহার তাহার স্পৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না।

স্বামীজিরও বিশ্বাস ছিল—ইহার দ্বারাও স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবাদ প্রমাণিত হয়। ফলতঃ সকল জীবেরই পরস্পর স্পর্শে ভাল মন্দ ভাবের আদান প্রদান হয়—তবে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ অনুসারে পরিমাণে তারতম্য হয় মাত্র। অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন না হইলে ইহা অনুভব করা সুকঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া এটা উড়াইয়া দেওয়া অসঙ্গত। *

এই বিষয়ে বিচারবিমূঢ়তার ফল আমরা একপ্রকার প্রত্যক্ষই দেখিতেছি—যত্র তত্র যা তা খাইয়া আমরা নিজে এবং আমাদের সন্ততিবর্গ যে কিরূপ অধোগতির পথে চলিয়াছে, আমাদের জীবনী-শক্তি যে কিরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সমাজহিতৈষী মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। "আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ;" "প্রমাদাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি"—এই মনুর বাক্য দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইতেছে। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রাচীন রীতিতে যাঁরা জীবন যাপন করিতেছেন—সেই অধ্যাপকগণ প্রায়শঃ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী. আর নব্য চালচলনে অভ্যস্ত হইতেছেন যাঁরা—তাঁরা অনেক পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এই বিবেকানন্দই তার এক প্রমাণ। এমন সুন্দর সবল দেহ—যৌবনের মধ্যভাগেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল—চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) মনে করিতেন উহা কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—ঐ লোকগুলি বিশুদ্ধচরিত্র নহে। প্রথমে এ কথা নরেন্দ্রের তত বিশ্বাস হয় নাই; কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলি অতি হীনচরিত্রের।" বিঃ ১৬২ পৃষ্ঠা।

* এই বিষয়ে প্রবন্ধান্তরেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছিল—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধের প্রতিবাদে এই বিবেকানন্দেরই উক্তির অসমীচীনতা দেখান হইয়াছে— অনুসন্ধিৎসু পাঠক "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস ১৭-২০ পৃষ্ঠা" দেখিতে পারেন, উহাতে অনেক ইউরোপীয় ডাক্তারের পরীক্ষালব্ধ তথ্যেরও উল্লেখ আছে।

পরমহংসের কৃপা এবং বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিপালন সত্ত্বেও আচারব্যত্যয়ে বিবেকানন্দ অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। * এই ছুঁৎমার্গ ব্যাপারেও যেন বিবেকানন্দের শেষকালে উল্টাসুর দেখা গিয়াছে। মঠের এক কুকুর ঠাকুর পূজার জন্ত আনীত জল নষ্ট করিয়া দেওয়ায় যে ব্রহ্মচারীর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহাকে খুব বকিয়াছিলেন। [বিঃ ১০৭৬ পৃষ্ঠা]

স্বামীজির গুরু ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে এস্থলে পুনরপি কতকগুলি কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের অবতার বলিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং সাধনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বস্তু এক এবং সেই এক বস্তুই ব্রহ্ম। এইটি একেবারেই কোনও অভিনব বিষয় নহে। শ্রীভগবান্ তো গীতায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" বলিয়া সমস্ত সাধক মণ্ডলীকেই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। সপ্তশতীতেও শ্রীশ্রীজগন্মাতা ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সর্ব্বদেব-

* বিবেকানন্দের জীবনচরিতলেখকের কথায় প্রত্যয় করিলে বলিতে হয়, এই উন্মার্গগামিতার নিমিত্তে পরমহংসও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী ছিলেন। তিনি নাকি বলিতেন "ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ তাপ সব পুড়ে খাক্ হয়। ও যদি শোওর গরুও খায় কোন দোষ হইবেনা।" (বিঃ১৩৩ পৃঃ) ঐ পৃষ্ঠা ফুটনোটে আরো আছে :—"ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া পরমহংস দেব স্বয়ং নানা নিয়ম পালনপূর্ব্বক ভক্ত সকলকে তদ্রূপ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনিই আবার বলিতেন, নরেন্দ্র ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিন্তু তাহার কোনও প্রত্যবায় হইবে না। নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে," ইত্যাদি। নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) যদি এরূপই ছিলেন, তবে তো স্বামীজির ছুৎমার্গাদি কথা বলিতে অধিকতর সাবধান হওয়াই উচিত ছিল ; কেন না, সকলের ভিতর (এমন কি স্বয়ং পরমহংস ও তদীয় অন্যান্ত ভক্তদের মধ্যেও যেন) 'জ্ঞানাগ্নি' তেমন তীব্রভাবে প্রজ্বলিত ছিল না ! ফল কথা বিবেকানন্দের সঙ্গে পরমহংসও এরূপে জড়িত হইয়া বিড়ম্বিত হইয়াছেন—ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

শক্তিকে স্বীয় শরীরে বিলয় করিয়া অসুরকে বলিয়াছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। পুষ্পদন্ত মহিম্নঃস্তোত্রে বলিয়াছেন—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শিবমন্দির দেবীমন্দির প্রভৃতিতে গিয়া বন্দনা করিয়া নৃত্যাদি করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"ঐ সে কালীকৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।"

ত্রিপুরার দেওয়ান রামদুলাল আরো দূর অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন,—

"মেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী॥

*　　*　　*　　*　　*

মগে বলে ফরাতারা গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা—মা
আল্লা ব'লে ডাকে তোমায় সৈয়দ পাঠান মোগল কাজী।" ইত্যাদি

এবং সর্ব্বশেষ বলিয়াছেন—

"একব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হ'য়েছে পাজী॥"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এই সমন্বয়ের ভাব হিন্দুর ধর্ম্মে বরাবরই রহিয়াছে—দু'চার স্থলে অজ্ঞ বৈষ্ণব ও মূর্খ শাক্ত পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়াছে—তাও কবি দাশুরায় শেষটায় 'সমন্বয়' করিয়া দিয়াছেন।

এই 'সমন্বয়' দেখানের জন্য সাধনা, সুতরাং অনাবশ্যক ছিল। যাহা তখন আবশ্যক ছিল, তাঁহা সাকার-বাদের প্রমাণ,—তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনা, উক্তি প্রভৃতি দ্বারা সনাতন সাধনরীতি ও ধর্ম্মচর্য্যার সারবত্তা প্রমাণিত হইয়া উন্মার্গপ্রস্থিত অনেকের উপকার হইয়াছে। এসকল কথা পূর্ব্বেও

বলিয়াছি। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সার্থকতা এইখানেই—এবং এইজন্য তিনি আমাদের বরেণ্য।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ কেবল তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে—একথাও মনে করা উচিৎ নহে। জ্বর প্রবল হইয়া খুব ঘর্ম্ম হইলে যেমন উপশম আরম্ভ হয়—তেমনই যখন ১৮৭২ সালে কেশবসেনের তিন আইন পাস্ হইল, তখনই প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইল—সুপ্রসিদ্ধ আদি ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় দেশে বিদেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ'সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল—রাজনারায়ণ বসু তাহা রক্ষা করিলেন।" পুণ্যশ্লোক ভূদেব বলেন, "আমাদিগের দেশের চূড়ামণিস্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রাধান্য প্রকটন পূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিজ্ঞ অপরিণামদর্শী অনুচিকীর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত।" *

বোধ হয় এই সময়েই 'হিন্দুমেলার'ও সৃষ্টি হয়—এবং তদ্দ্বারা স্বদেশেরও পূর্ব্ব গৌরব স্মৃতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া লোকের 'মোহ' কাটিবার সহায়তা হইয়াছিল। এবং প্রায় এই সময়েই থিওসফির দল ভারতে আসিয়া যোগ-মাহাত্ম্য প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক পরমহংসদেবের তথা বিবেকানন্দের ভক্তগণ কর্ত্তৃক

* বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ—১৫২ পৃঃ। ভূদেব বাবু পরমহংসদেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন—কৌতূহল তৃপ্ত্যর্থে উদ্ধৃত হইল। "ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দুমতবাদের শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া যদি প্রকৃত তান্ত্রিকসাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্ব্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজমধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্ম্মী ও ধার্ম্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।" ১৬৬ পৃষ্ঠা।

লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থ সমূহের এবং স্বামীজির বক্তৃতাদিতে গুরু শিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতা পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া ৺ কাশীতে বীরেশ্বর শিবের অর্চ্চনা করাইয়াছিলেন—নিজেও শিবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। অতঃপর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন "যেন যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।" (বিঃ ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা) পুত্রের জন্ম হইলে তাই জননী নাম রাখিয়াছিলেন 'বীরেশ্বর' (১২ পৃঃ)। * এদিকে যখন বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রথম বার † গিয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব (নরেন্দ্রের গান শুনিবার পরে) "হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন ও ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া দরবিগলিত-ধারে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় বলিতে

* ঢাকা দেওভোগের নাগ মহাশয় (শেষ অবস্থায়) স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াও বলিয়াছেন—"ঔঁ ঔঁ জয় শঙ্কর জয় শঙ্কর সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল।" (বিঃ ৯১৮ পৃঃ।

† ইহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতলেখকের মত। শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকার বলেন, এইটি দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকার। (বিঃ ১০৭ পৃঃ ফুটনোট) অথচ উভয়েই স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন! এস্থলে ইহাও বক্তব্য, ৺ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়-কৃত পরমহংসদেবের জীবনচরিতে বিবেকানন্দসম্বন্ধীয় এত সব কথা নাই—অথচ তিনি (রামচন্দ্র বাবু) বিবেকানন্দের আত্মীয় ও পিতৃ অন্নে পালিত 'রামদাদা' ছিলেন (বিঃ ১০৬-৭)। [পরমহংসদেব শ্রীচৈতন্য হইলে রামচন্দ্র দত্ত 'অদ্বৈত' (কেননা তিনি সর্ব্বাদৌ রামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলেন) এবং বিবেকানন্দ 'নিত্যানন্দ' ছিলেন। "ভারতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ" শীর্ষক, একটি চিত্রে দেখিলাম—শ্রীচৈতন্য যেমন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সহ বিরাজমান—রামকৃষ্ণও রামচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ সহ সমাসীন। এইরূপে 'প্রচার' করিতে এই সম্প্রদায় কোনও কসুর করেন নাই। বাগচীর পঞ্জিকায় রামনবমীতে রামচন্দ্রের অথবা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর কোনও চিত্র নাই—কিন্তু পরমহংসের জন্মতিথিতে তাঁহার ছবি দেওয়া হইতেছে।]

লাগিলেন, 'এতদিন পরে আস্‌তে হয়! আমি যে তোর পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি তা কি একটি বারও মনে কর্ত্তে নেই? বিষয়ী লোকেদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার যে ঠোঁট পুড়ে যাবার মতন হয়েছে'; এই কথা বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন 'প্রভু আমি জানি তুমি কে? তুমি সেই পুরাতন ঋষি. নরনারায়ণ, জীবের দুর্গতিনিবারণের জন্যই তোমার শরীর ধারণ হইয়াছে'—ইত্যাদি * (বিঃ ১০৭—৮ পৃঃ)। পরে আছে, নরেন্দ্রের সম্বন্ধে "তিনি (পরমহংস) প্রায়ই বলিতেন 'ও খাপখোলা তলোয়ার।' 'পুরুষের ভাব ওর ভেতর।' 'ও অখণ্ডের (নিরাকারের) ঘর' 'সপ্তর্ষির একজন' 'নরনারায়ণ ঋষির নর' ইত্যাদি ইত্যাদি।" (বিঃ ১৩০ পৃষ্ঠা। সপ্তর্ষির মধ্যে 'নর-নারায়ণ' ছিলেন কি?—এবং একই ব্যক্তি নর (বা নারায়ণ) ও 'সপ্তর্ষির একজন' কিরূপে হইতে পারে? আরও দেখুন; "পরমহংসদেব বলিয়াছেন * * * ও (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) যখন নিজকে জান্‌তে পার্‌বে ওকে তখনই দেহ ত্যাগ কর্‌বে।" (বিঃ ১০৮৫ পৃঃ) অথচ বিবেকানন্দ যে জাতিস্মর ছিলেন, তৎসম্বন্ধেও লেখা আছে; গোপালশীলের বাগানে অবস্থান কালে,(১৮৯৭ অব্দে) "হঠাৎ একজন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজি, আপনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় জানেন?' তিনি উত্তর করিলেন—'হাঁ, নিশ্চয়ই।' কিন্তু যখন তাঁহারা অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিবার জন্য তাঁহাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন

* "লীলাপ্রসঙ্গপ্রণেতা বলেন, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরমহংসদেব স্বামীজিকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কথামৃতে (৩য় ভাগের প্রথম-সংস্করণে ২৮৭ পৃঃ আছে)'প্রথম দিন নয়, কিন্তু অন্য আর একদিন। বিঃ ১০৮ পৃঃ ফুটনোট। [পূর্ব্ব পাদ-টীকায় উল্লেখিত ১০৭ পৃঃ ফুটনোটের সঙ্গে এইটুকুর তুলনা করিয়া যিনি যাহা পারেন বুঝুন।]

"আমি সবই জানি এবং ইচ্ছা করিলে আরো জানিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।" (বিঃ ১০৫ পৃষ্ঠা) তিনি নিজের পূর্ব্ব কথা—তিনি যে কি—তাহা জানিতেন; তার পরেও পাঁচ বৎসর কাল দেহ ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পরমহংস দেবের কথাটা প্রমাণিত হইল কি?

আরো আছে—"স্বামীজির জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিয়াছিলেন যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দিঘ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আকাশের উত্তরপশ্চিম দিক্ হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে শিমুলা পল্লীর দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন 'এইবার যে আমার কাজ করবে সে এল।' এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন শহরের সহিত তাঁহার আগমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আভাস দিয়াছেন। কে বলিবে সেই শহর ৺কাশীধাম কি না?" (বিঃ ১০৬-৭১ পৃষ্ঠা—ফুটনোট্।)

বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩—জানুয়ারী; অতএব জ্যোতির্দর্শন ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে হইবার কথা। তখন রামকৃষ্ণ কোন্ অবস্থায় ছিলেন—সেটাও বিবেচ্য। সে যাহা হউক, এই জ্যোতিঃ নরনারায়ণের স্থান বা সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে আইসে নাই—কেননা উত্তর পশ্চিমের শহর বিশেষের সহিত ঐ আগমনের সম্বন্ধ ছিল। এবংবিধ নানা প্রকার কথা পরমহংস দ্বারা কথিত, এইরূপ প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার প্রতি আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কি পরিমাণ অব্যাহত থাকিতে পারে—সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

তারপর বিবেকানন্দ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার নমুনা দিতেছি:—"অবতার বল্লে তাঁকে ছোট করা হয়।" (বিঃ ১৫১ পৃষ্ঠা) "পরমহংস ইচ্ছা করিলে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।" (বিঃ অবতরণিকা ১৩ পৃষ্ঠা) "শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই" (পত্রাবলী ৮নং পত্র

৪৫ পৃষ্ঠা)। * ইত্যাদি। অবশ্য এগুলিতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই!! এদিকে তো এই পর্য্যন্ত—পরন্তু পরমহংস দেবের জীবনের ঘটনাগুলিরও খবর তিনি ঠিক্ ঠিক্ রাখিতেন কিনা সন্দেহ। 'My Master বিষয়ক বক্তৃতায় পরমহংসদেবের স্ত্রীর যৌবন প্রাপ্তির পরে প্রথম সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—" * The husband had entirely forgotten that he had a wife. In her far off home the girl had heard that her husband had become a religious enthusiast * * *. She resolved to learn the truth for herself, so she set out and walked to the place where her husband was. When at last she stood in her husband's presence he at once admitted her right to his life; * * * The youngman fell at the feet of his wife and said: I have learnt to look upon every woman as Mother but I am at your service." The maiden was a pure and noble soul, and was able to understand her husband's aspirations and sympathise with them. She quickly told him that she had no wish to drag him down to a life of worldliness; but that all she desired was to remain with him, to serve him and to learn of him," (pp. 21—22 Natesan's collection of Speeches of Swami Vivekananda.) অথচ ৺ রামচন্দ্র দত্তকৃত জীবনবৃত্তান্তে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্ত্রী যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হন সেই সময় তাঁহার শ্বশুরালয়

* বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও তো স্বামীজি বলিয়াছেন—"মনুষ্যজাতির মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (বিঃ ৮৬৯ পৃঃ)।

গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। * * * তন্ত্রমতে নাকি ষোড়শী পূজার বিধি আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীতে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।" * তারপর, কিরূপে তিনি ঐ পূজা সম্পাদন করিলেন, সেই সকল এই অধ্যায়ে (১৮শ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে আছে, "পরমহংস দেবের স্ত্রীর মনের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি ষোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহার তখন পর্য্যন্ত কুমারী ভাব ছিল। পতি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তন্নিমিত্ত এক্ষেত্রে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।"

আবার দেখুন, যখন প্রকৃতিভাবাবলম্বনে তিনি কিয়দ্দিন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন—তদ্বিষয়ে ঐ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"He began to think that he was a woman; he dressed like a woman * * * and lived among the women of his own family, * * *" (p. 23. Natesan's collection of lectures). রামচন্দ্র দত্তকৃত জীবনবৃত্তান্তের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে—এবং তিনি যে জানবাজারে মথুর বাবুর বাড়ীর অন্তঃপুরে তখন অবস্থান করিতেন, সে কথা স্পষ্ট রহিয়াছে। পরের অন্তঃপুরে স্ত্রীবেশে থাকাটা ব্রীড়াজনক মনে করিয়াই কি স্বামীজি পরমহংসদেবকে স্বীয় পরিবারস্থ মেয়েদের সঙ্গে অবস্থান করাইয়াছেন?

তারপর পরমহংসদেব, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট শম্ভু মল্লিককে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন, "কথামৃত" হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে:—"শম্ভু বল্লে. এই আশীর্ব্বাদ করুন, যা টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়; হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা, কুয়ো করা এই সব! আমি বল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল,

* রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত তৃতীয় সংস্করণ ৪৯ পৃষ্ঠা।

কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক্, এটা যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়। * * * এই সব অনিত্য বস্তু, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, তাঁকে লাভ হলে আবার বোধহয় তিনিই কর্ত্তা, আর আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁহাকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি হ'তে পারে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—প্রথম ভাগ ১২৭ পৃষ্ঠা।) এইরূপ আরো দু-এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন। স্বামীজি এ বিষয়ে বিপরীত পথেই চলিয়াছেন; রামকৃষ্ণ মিশন * সংস্থাপনে এখন হাস্পাতাল ডিস্পেন্সারিই সার ও মুখ্য সাধন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার গুরুভ্রাতারা ইহা পরমহংস-দেবের মতের বিরোধী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠা তাঁহাদের কর্ম্ম নয়। 'মিশন' স্থাপিত হইলেও যখন একদিন জনৈক গুরুভ্রাতা ব্যাপারটা ঠিক্ হইতেছে না বলিলেন, তখন স্বামীজি প্রথম সব্যঙ্গগালি দিয়া, তৎপর ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তোমরা মনে করেছো, যে তোমরাই তাঁকে বুঝ্তে পেরেচ, আর আমি কিছুই পারি নি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুষ্ক জিনিস। তার চর্চ্চা ক'রতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে গলাটিপে মার্তে হয়। তোমরা যাকে ভক্তি বল্‌ছো সেটা যে দারুণ আহাম্মকী, কেবল মানুষকে দুর্ব্বল করে মাত্র, তা বুঝ্‌চো না। যাও,

* মিশন সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইল না—প্রয়োজন হইলে পশ্চাৎ করা যাইতে পারিবে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই এবং কাজও কিছু কিছু হইয়া থাকে। তবে মাতাপিতা প্রভৃতি অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবযুবকগণ মঠে মিশনে আসিয়া চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করে—ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চায়? দেখতে চায় তোমার শাস্ত্র কি বল্‌ছে? যদি আমি আমার দেশের লোককে 'তমোকূপ' থেকে তুলে মানুষ ক'রে গড়্‌তে পারি, যদি তাদের ভেতর কর্ম্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুল্‌তে পারি, তা হ'লে হাস্‌তে হাস্‌তে সহস্র নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ টামকৃষ্ণ কারুর কথা শুন্‌তে চাইনি। যে আমার মতলব অনুসারে কাজ কর্‌তে চায়, তারই কথা শুন্‌বো। আমি রামকৃষ্ণ কি কারুরই দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি বা মুক্তি গ্রাহ্য না ক'রে পরের সেবা কর্‌তে প্রস্তুত, তারই দাস।"

(বিঃ ১২৩—২৪)

এই ঝড়ের পর কিঞ্চিৎ বর্ষণও হইয়াছিল; ঐরূপ বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিছু সময় পরে যখন স্বামীজি বাহিরে আসিলেন, তখন ঠাকুরের জন্য যে তাঁর কত ভক্তিবেগ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওঃ এখনও আমার অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে; আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস, তিনি আমার ঘাড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যত দিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।" ইত্যাদি (বিঃ ১২৫ পৃঃ)। এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল যে, তিনি রামকৃষ্ণদেবের বা অভিমত, তাহার অনুকূল ছিলেন না। মানুষ রাগিলেই পেটের কথা বাহির হইয়া যায়—এক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ মনের কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—ফলতঃ তিনি "সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র"—কাহারো 'দাস' হইবার লোক ছিলেন না—"নত্ত কারো ভৃত্য নয়।" তবে দল না বাঁধিলে চলে না—তাই গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে 'আপোষ' করিয়া চলিয়াছেন—গুরুভ্রাতারাও বুদ্ধিমানের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে ইহারই নাম-ডাকের সঙ্গে তাঁহাদের গুরুদেবের তথা সম্প্রদায়ের সম্মানগৌরব বিজড়িত। তাই বোধ হয়, এ বিষয়ে অতঃপর আর তাঁহাদের কেহ কোনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই।

কথায় ও কাজে বৈপরীত্য সূচক দু'একটি বিষয় আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি সম্প্রতি আরো দেখান যাইতেছে। লাহোরে লালা হংসরাজকে তিনি প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন—"আর শাস্ত্রের গোঁড়ামী অপেক্ষা মানুষের গোঁড়ামী (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁর আশ্রয় লইলেই মুক্তি— এইরূপ প্রচার) দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার রূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরু ভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক চা'র বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি উহাতে ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমিও গোঁড়ামী প্রচার করিব।" (ভারতে বিবেকানন্দ—২য় সংস্করণ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

এই কথা তিনি ১৮৯৭ অব্দের নভেম্বরে বলেন। এ দিকে ঐ কথায় তিন মাস মাত্র পর (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) [মতান্তরে ১৮৯৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ ঐ কথার ৯।১০ মাস পূর্ব্বেই] তিনি নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে রামকৃষ্ণের পোর্সিলেনের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় যোগ দিয়াছিলেন এবং মন্ত্রাদি বলিয়া যথানিয়মে পূজা করিয়াছিলেন। প্রণাম-মন্ত্রও রচিত হইয়াছিল—তাহা এই "স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥" (বিঃ ৮০০—৮০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঠাকুরের জন্মদিনে ব্রাত্য বিপ্র সকলেই তাঁহার নাম লইয়া শুদ্ধ হইয়াছিল—এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। "গোঁড়ামী" আর কাকে বলে?*

* অথচ ঢাকায় তাঁহাকে একটি ছেলে কোনও ব্যক্তির একথা নি 'ফটো'

যখন রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের চারি বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতভ্রমণে বহির্গত হন, তখন একদা একজন কৃতবিদ্য থিয়োসোফিষ্টকে রেল গাড়ীর কামরায় পাইয়া মহাত্মগণের অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া স্বামীজি তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুকালাপের পরে উপদেশচ্ছলে বলিলেন—"* * * ধর্ম্মের সঙ্গে অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধির যে নিত্যসম্পর্ক আছে, এটা কেমন করে তোমার মাথায় সেঁধুল? কিন্তু এটা দেখ্‌ছ না ঐরূপ সিদ্ধির ব্যবহার যাহারা করে তাহারা কত বড় কামনার দাস? অহঙ্কারের ঢেঁকি! যথার্থ ধর্ম্ম আনে চরিত্র—সেইটাই হচ্চে প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান্ পুরুষের রিপু দমন ও বাসনা ক্ষয় হয়েছে। আর যারা সিদ্ধি সিদ্ধি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও একটা অলৌকিক শক্তি চাচ্ছে, তারা জীবনসমস্যা সমাধানের পথে একটুও এগোয় নি, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার কচ্ছে ও স্বার্থপঙ্কে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। * * * বৃথা শক্তি-ফক্তির লোভে ছুটো না। ও সব আলেয়া।" (বিঃ ৩৪৭ পৃঃ)

কিন্তু যখন তিনি ঐ বারই বরাহনগর মঠ হইতে হিমালয় যাইবেন বলিয়া যাত্রা করেন, তখন গুরু ভাইদিগকে বলিয়াছিলেন, "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদ্‌লে ফেল্‌তে পারার ক্ষমতা লাভ না করে ফির্‌ছি

দেখাইয়া ইনি 'অবতার' কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে, স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"বাবা, এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো। তা হলে মাথাটা খুল্‌বে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।" আবার বলিলেন "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বল্‌তে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কত্তে পারে। কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হচ্ছে, এ কি রকম? ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে বা যখন তখন হয় না।" ইত্যাদি) বিঃ ১০২৩ পৃঃ)। এই অবতার গজাইবার জন্য যে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধানতঃ দায়ী—ইতঃপূর্ব্বেই এ কথা বলা হইয়াছে। ফলতঃ 'অবতার' সাজার মত নিরাপদ্ আর কিছুই নহে—'বা' 'তা' বলিলে বা করিলে "ঠাকুরের লীলা" মাত্র বলিলেই সমস্ত সঙ্গত হইয়া যায়!

না।" (বিঃ ২০৫ পৃঃ) এটা কি "অলৌকিক" কিছু নয়? এটা যে একটা স্পৃহণীয় ও প্রশংসার জিনিস, তা' তো পরমহংসদেবের "ভস্মাবশেষরক্ষিত কৌটাটি" গঙ্গাজলে ধুইয়া নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে খাওয়াইয়া তাঁহাকে ১০৭ ডিগ্রী জ্বর হইতে মুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "ত্যাখ্ ঠাকুরের শক্তি দেখ্। তিনি কি না কর্‌তে পারেন।" (বিঃ ১০৫৩ পৃঃ) এমন যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঠাকুর, তিনি যাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন, সে পদার্থটা তো ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শরীরেই সংক্রামিত হইয়াছিল। সে কথা তিনিই শিষ্য শরৎ বাবুকে বলিয়াছিলেন—"স্বামীজি। ব'সে থাক্‌বার যো আছে কি বাবা ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাক্‌তেন, ঠাকুরের দেহ রাখ্‌বার দু তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাদের এদিক ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়"—ইত্যাদি, এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে (বিঃ ১৪৮ পৃঃ) উল্লেখিত পরমহংস দেব কর্ত্তৃক তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ঘটনাটি বিবৃত করেন। (বিঃ ১০৩৪-৩৫ পৃঃ)

স্বয়ং 'কালী' যাঁর দেহ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—তার আর কোনও সিদ্ধাই অর্জ্জনের দরকার ছিল কি? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমহংস তো তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন—"তোর ভিতর দিয়েই আমার সিদ্ধাই কাজ কর্‌বে।" (বিঃ ১৪৯ পৃষ্ঠা) পাঠকবর্গ এই সকল কথার সঙ্গতি বিধান করুন। স্বামীজি কাশ্মীরে (জুলাই ১৮৯৮) অমরনাথে গেলে নাকি "স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবের কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরলাভ করিয়াছিলেন।" * (বিঃ ৮৮৭ পৃঃ) প্রায় সেই সময়েই (যে ১৮৯৮) নৈনিতালে জনৈক মোসলমান অদ্বৈতবাদী নাকি "স্বামীজি দর্শনে ও তাঁহার আধ্যাত্মিক

* দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া অকালে ৩৯ বৎসর বয়সে যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন—তিনি নিশ্চয়ই "ইচ্ছামৃত্যু" বরপ্রাপ্ত!

শক্তির পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি, যদি ভবিষ্যতে কেহ কখনও আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে মনে রাখিবেন—আপনার এই মুসলমান বান্দাই তাহাদিগের সকলের অগ্রণী হইবে।" (বিঃ ৮২৮-২৯ পৃঃ) কিন্তু বিবেকানন্দের কোষ্ঠীর তেমন জোর ছিল না * তাই তিনি অবতার হইলেন না—কিন্তু তাঁহার জন্মতিথিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সাক্ষাতে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক পূজার্চ্চা হইয়াছে—এ সংবাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

কি উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় গমন করেন, এ বিষয়ে হায়দ্রাবাদে "My mission to the west" শীর্ষক বক্তৃতায়, সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"এই উদ্দেশ্য মাতৃভূমির লুপ্তগৌরব উদ্ধার ব্যতীত আর কিছুই নহে!" সভায় তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিলেন যে, এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ধর্ম্ম-প্রচারকের বেশে দূরতম পাশ্চাত্য প্রদেশে যাইতে হইবে এবং বেদ-বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে।" (বিঃ ৩৭৪-৩৭৫ পৃঃ) পরন্তু মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই যেন উদ্দেশ্যের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইল—তিনি আমেরিকা যাত্রার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমার যাওয়া যদি মার অভিপ্রেত হয়, তবে সাধারণ লোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত; কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্য।" (বিঃ ৩৭৭ পৃঃ) বোধ হয় হায়দ্রাবাদে আমীর ওমরাহদের সভায় দরিদ্রের কথাটা স্বামীজির মনে উদিত হয় নাই। তবে তাঁর "প্রিয় ম—"র নিকটে লিখিত চিঠিতে কিন্তু আছে—" * * * জীবনের

* এই কথাটা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে—বিবেকানন্দের দেহপতি শনি ধর্ম্মস্থানে উচ্চাভিলাষী—পরমহংসের শনি তুঙ্গ বা উচ্চস্থ। "সুতরাং তাঁহার (পরমহংসের) তুলনায় (শনি) অল্প ফলপ্রদ এবং সেই জন্যই ইনি (বিবেকানন্দ) তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।" (বিঃ কোষ্ঠী বিচার দ্রষ্টব্য।)

সারাংশটা আমেরিকায় কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা শক্তি ছিল, সব খোয়ালুম—কেন? না, ও দেশের লোককে উদার উন্নত কর্‌বার জন্য ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য।" (বিঃ ৭৪৪ পৃঃ)। পরন্তু আমার বোধ হয় গুজরাটে পোরবন্দর রাজসভায় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্য উৎসুকতা জন্মে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "সত্যই স্বামীজি, ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্য দেশে গমন করুন এবং সে দেশে আগুন জ্বালিয়া আসুন—দেখিবেন এ দেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে, বসিতেছে।" (বিঃ ২৭৮-৭৯ পৃঃ) একটা বড় কিছু হব—এই উৎসর্পিণী বাসনা—ইংরাজীতে যাকে 'এম্বিশন' (ambition) বলে—বিবেকানন্দের প্রকৃতিতে অতীব বলবতী ছিল।*

এইরূপ লোকের একটা প্রবল আত্মাদর থাকে—সামান্য লোকের বিষয়ে ঐটাই দম্ভ বলিয়া আখ্যাত হয়। মহাকবি ভবভূতির প্রতিধ্বনি করিয়া 'ভারতী' সম্পাদিকার নিকটে লিখিত পত্রে তিনি বলিয়াছেন—কিন্তু আশা এই—"সম্পৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" (পত্রাবলী নং ১৫ প্রথম ভাগ ৮২ পৃষ্ঠা)।

তিনি ইউরোপ হইতে এক পত্রে শিষ্যদিগকে লিখিয়াছেন—"আমি ভারতের যেমন, সমুদয় জগতেরও তেমনি। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি

---

* তদীয় জীবনচরিতের অবতরণিকায় (৩ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"প্রাচীন কালের জুলিয়াস্ সীজার, আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট্ ও ইদানীন্তন কালের মহাবীর নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি ২।৪টি মহাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শক্তিশালী পুরুষ বোধ হয় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই বাক্যে উৎকট অত্যুক্তি থাকিলেও কিছুটা যথার্থতা আছে—সীজার, আলেক্‌জাণ্ডার ও নেপোলিয়ান্ ইহারা সকলেই দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি ছিলেন—বড় লোক ছিলেন, কিন্তু পুণ্যশ্লোক ছিলেন না।

আমার পশ্চাতে এক মহাশক্তি দাঁড়িয়ে আমায় চালাচ্ছেন। আমি কারও সাহায্য চাই না। * (বিঃ ৫২৫ পৃঃ)

শিলংএ নাকি শ্বাসের পীড়ায় কাতর হইয়া আপনা-আপনি বলিয়াছিলেন—"যাক্ মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক।" (১০২৩) [তিনি না 'ইচ্ছামৃত্যু' বরপ্রাপ্ত—তবে এই 'মৃত্যুই যদি হয়' ইত্যাদি কেন?]

শিষ্যকে বলিতেছেন,—হীন সাহস হইলে ভাবিবে—"আমি * * অমুকের (অর্থাৎ স্বয়ং স্বামীজির) চেলা, * * এইরূপ খুব অভিমান রাখ্‌বি।" (বিঃ ১০৫০-৫১)

মৃত্যুর দিনেও নাকি অস্ফুট স্বরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো, তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" (বিঃ ১০৮৭ পৃঃ)। এ সকলের উপর টীকা অনাবশ্যক।

স্বামীজি আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য স্ত্রীলোকদের হইতে যখন খুব প্রশংসা ও সহায়তা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সম্বন্ধে যে সব চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উহাদের অতিশয় সুখ্যাতিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। মাদ্রাজে শিষ্যগণের নিকটে ২।১১।৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে—'আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত' (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩১পৃষ্ঠা)। শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রের নিকটে লিখিত ২৮ ১২।৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে "* * এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। * * * এ দেশের তুষার যেমন ধবল,

* বিবেকানন্দ মহাসভায় বক্তৃতা দিয়া নামজাদা হইবার পূর্বে মাদ্রাজী শিষ্যদের নিকটে লিখিত পত্রে তো সাহায্য প্রেরণের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন! (পত্রাবলী—প্রথম ভাগ ১৫-২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তখন এই 'মহাশক্তি' কোথায় ছিলেন?

তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। * * * * আর এদেশের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫।৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হ'লে খারাপ হ'য়ে যাবে। আমরা কি মানুষ? * * * * ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি কর্‌ছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা) খেতড়ির রাজাকে ১৮৯৪ অব্দে যে পত্র দেন, তাহাতে ছিল—"আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চাল-চলন নহে—তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখ, শান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি, ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত। আমেরিকাবাসিনী রমণীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শতজন্মেও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না।" তারপর কিরূপে তিনি অসহায় অবস্থায় ঐ সকল রমণীদের নানাপ্রকারের সাহায্য লাভ করেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—পরে বলিয়াছেন—"কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি, যাহাদের নির্ম্মল চরিত্রের—যাহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল—আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং

সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না।" তবে তিনি তাহার মন্দ ভাগও যে দেখেন নাই—তা নয়—কিন্তু তাহার উল্লেখ কি সংযত ভাবে ও সাবধানে করিয়াছেন—"তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে, ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহা-দিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপদার্থ অসার অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণা করিলে চলিবে না, কারণ উহারাও আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র, তাহাদ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।" (বিঃ ৭৫১-৫৩ পৃঃ) খুব উদার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দুই বৎসর পরে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আসিয়াই যেন "বদলিয়ে গেল মতটা।" ১৮৯৬ অব্দে বিলাতে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন— *

"The Hindus to produce a little chastity in the race, have degraded all their children by child marriage, which in the long run has degraded the race. † At the same time I cannot deny that this child marriage makes the race more chaste. What would you have?

* কথাগুলি সমস্তই জানা আবশ্যক বলিয়া একটু বিস্তৃত 'কোটেশন' করা হইল। বিবেকানন্দের জীবনী লেখক এই সকল কথার উল্লেখ করেন নাই—করিলে ডাঃ ব্যারোজ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা যে অন্ততঃ আংশিক সত্য, এটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন।

† এটা কি ঠিক? তিনি তো "My Master" বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়া-ছেন—This boy (রামকৃষ্ণ) had been married at the age of about eighteen to a little girl of five. Of course such a marrige is but a betrothal. The real marriage takes place when the wife grows older when it is customary for the husband to go and bring his wife to his own house (Natesan's Collections p 21).

If you want the nation to be more chaste, you degrade men and women physically by this awful child marriage. On the other hand, are your safe on your side? No, because chastity is the life of a nation. Do you not find in the history that the first death sign of a nation has come through unchastity? When that has entered, the end of the nation is in sight. Where shall we get a solution of these miseries then? If parents select husbands and wives for thir own children, then this evil of love is prevented. The daughters of India are more practical than sentimental. Very little of poetry remains in their lives. Again, if people select their own husbands and wives that does not bring much happiness. The Indian woman is very happy, there is scarcely a case of quarrelling between husband and wife. On the other hand, in the United States, where the greatest liberty obtains, scarcely is there a happy home. There may be some, but the nunber of unhappy homes and marriages is so large that it passes all description. Scarcely could I go to a meeting or society but I found three quarters of the women present had turned out their husbands and children. It is so here there and everywhere." Natesan's Collections, "Maya and Illusion"—pp 203—204).

এই গেল আমেরিকার নারীবিষয়ক কথা। এখানে এইটুকু

উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, যিনি সভাপতিরূপে তদানীং অপরিচিত বিবেকানন্দকে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে গিয়া বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ করেন—তন্মধ্যে আমেরিকার নারীগণের অযথা নিন্দাও একটা বিষয়। এই অভিযোগের উত্তরে স্বামীজি আমেরিকার জনৈক বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছেন—"একটা বক্তৃতায় আমি মিসুদের (অর্থাৎ মিশনারিদের) সম্বন্ধে ও তাদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা বলেছিলাম—অবশ্য ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদের বাদ দিয়ে—আর সেই সঙ্গে আমেরিকায় চার্চ্চওয়ালা স্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শক্তিসম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এটাকে নিয়ে মিসুরা খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি সমস্ত আমেরিকার নারীজাতির নিন্দা করেছি—মতলব আর কিছুই নয়—ওদেশে আমি যে একটা করে এসেছি, সেটা পণ্ড করা। ইত্যাদি (বিঃ ৭৪৩ পৃঃ)।* এ সকলের সঙ্গতিবিধান পাঠকগণ নিজেরাই করিবেন। আমিতো দেখিতেছি কেবল 'মায়া ও ইলিউশন' !!

ভারতের নারীগণের সম্বন্ধেও বিবেকানন্দের দু'য়েথা কথা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণ জনগণ সম্বন্ধেও তদীয় মতামত উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি।

আমেরিকার পথ হইতেই চীন ও জাপান দর্শনান্তে মাদ্রাজী বন্ধুগণের নিকটে লিখিত চিঠিতে আছে—"শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে,

* বিবেকানন্দচরিত-লেখক মহাশয়ও বলিয়াছেন "কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বামীজীর কোন লেখায় বা বক্তৃতায় আমেরিকান রমণীগণের বিরুদ্ধে একটি কথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।" ইত্যাদি (বিঃ ৫৮১ পৃঃ।)

তোমরা কি বল দেখি ?" আবার আছে "এসো মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্তথেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে" তারপর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মান্দ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হইয়াছে তাদের মানুষ করবার জন্যে আমরণ চেষ্টা করবে ?" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ১৩-১৪ পৃষ্ঠা) তারপর ভারতে আসিয়া একদিন এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন, যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, সে জাতটা মরেছে—যেমন আমাদের জাত।' (বিঃ ৬১৮ পৃঃ) এখন পাশ্চাত্য সমাজের লোকসাধারণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যাউক। মান্দ্রাজী শিষ্যগণের নিকটে ২।১১।৯৩ তারিখে চিকাগো হইতে লিখিত পত্রে আছে "এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেননা উহাদের মত শিক্ষিত হইব ? অবশ্য হইব।" আমরা দরিদ্র বলিয়া যদি ওজুহাত দেই—এই মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন "মনে করিওনা আমরা দরিদ্র *; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কিনা।" (পত্রাবলী প্রথমভাগ ৩৪ পৃষ্ঠা) এই পাশ্চাত্য "সুশিক্ষিত"

* অথচ আমেরিকার পথ হইতে প্রাগুল্লিখিত পত্রের একস্থানে আছে "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতাসোপানে একপদও অগ্রসর হইতে পরিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাঁহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না। (পত্রাবলী ১ম ভাগ ৮ পৃষ্ঠা)।

কুলি প্রভৃতির জ্ঞান ও চরিত্র কিরূপ, স্বামীজির বর্ণনায় দেখা যাইবে। তিনি গল্প করিয়াছিলেন, "এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে গিয়াছিলেন * * * * জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি খ্রীষ্টকে জানো ?' তাহাতে শ্রোতৃবর্গের একজন বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত উত্তর করিল, 'আজ্ঞে তার নম্বরটা কত ?' * *" এই বলিয়া স্বামীজি গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশ্চাত্যের লোকেরা এশিয়ার লোকের মত ধর্ম্মপ্রাণ নহে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লণ্ডন বা নিউইয়র্কে গেলে প্রথমেই দেখে—সেখানকার দুর্নীতিপরায়ণতা তাহার কল্পিত নরকের চেয়েও বেশী। এশিয়ার লোক যতই অধঃপতিত হউক, লণ্ডনের হাইড্‌পার্কে দিন দুপুরে যে সব কাণ্ড ঘটে তা দেখলে তারও মনে ঘৃণা হয়।" * তিনি বলিতেন, "পাশ্চাত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু যে তাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ, তা নয়, এদিকে খুব গোঁড়া ও অসভ্য।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, এক কয়লার গাড়ীর গাড়োয়ান তাঁহার প্রাচ্য পোষাকের উপর একটা কয়লার চাই ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। (বিঃ ৮৩০-৩১ পৃষ্ঠা) তবে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর জন্য স্বামীজির এত দরদ কি জন্য ? এদের 'পশুত্ব' কোথায় ? দারিদ্র্য তো নিম্ন শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত শ্রেণীতেই তাহা অল্লাধিক রহিয়াছে—পুরোহিতশ্রেণীতে তো দারিদ্র্য নিত্যসিদ্ধ। তারপর 'জাতটা মরেছে' বলিয়াছিলেন—আবার তিনিই অন্যরূপও বলিয়াছেন। যদি কেহ বলিত, ভারতীয় জাতি জরাগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা

* কিন্তু ভারতে অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলায় নাকি তিনি সিষ্টার নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, "হা ভগবন্! এরূপ না হইয়া যদি ইহার বিপরীত হইত! কারণ এই আপাতদৃষ্ট ধর্ম্মভাব বা অপরাধের অল্পতা, এটা মৃত্যুর লক্ষণ।" (বিঃ ৯৩৫ পৃষ্ঠা) এর উপর আর কথা চলে না। ইহাই কি "ধর্ম্মপ্রচারকের" উক্তি !!

হইলে তিনি নানা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেন, "জাতিটা প্রাচীন হইলেও যুবার ন্যায় সবল ও সতেজ আছে, তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাজ যত শীঘ্র বিদেশের সভ্যতাকে আপন শরীরের অংশবিশেষে পরিণত করিয়া লয়, অপর কোনও সমাজ তাহা পারে না।" (বিঃ ৮২০-২১ পৃঃ)।

তিনি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া এক ইংরেজী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"Social matters in India have not been free, but religious opinion has. Here (অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে) a man may dress any way he likes, or eat what he likes, no one says nay or objects; but if he misses attending the Church Mrs. Grundy is on him. "Maya and the conception of God"—Natesan's Collection p. 222. (বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না)। কিন্তু এই তুলনা কি ঠিক্? এখানে কি কেহ কোনও পোষাকে কোনও দিন আপত্তি করিয়াছে? এই যে ইংরেজীশিক্ষিতের দল কেহ কোট্-প্যাণ্ট, কেহ চোগা চাপকান্, কেহ হেট্-কোট্, কেহ পাগড়ী, কেহ শাম্লা, কেহ ক্যাপ, নানারূপ পোষাক পরেন—একজ্য কি কেহ সমাজচ্যুত হইয়াছেন? অবশ্য খাদ্যাখাদ্য বিচার একটা আছে—কিন্তু তাহাতেও কেহ ভাত, কেহ লুচি, কেহ মৎস্য মাংস, কেহ নিরামিষ ভোজন করিতেছে—তজ্জন্য কে কবে সমাজবহিষ্কৃত হইয়াছে? আর পাশ্চাত্যেরা এখানে আসিয়াও এই গ্রীষ্মের মধ্যেও ধুতি পরে না—তাহাদের আট-সাট পোষাকই পরিধান করে—কচিৎ ভাত খায়—পরন্তু মদ্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারই করে। ও দিকে বিদেশীয়েরা পাশ্চাত্য দেশে গিয়া যদি অন্যরূপ পোষাক পরে, তবে যে বিড়ম্বনা হয়, ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই দেখান হইয়াছে। তাঁহার একখানি পত্রেও আছে:—"এদেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড়ই খুঁৎখুতে, আর এদেশে তাহাদেরই

প্রভুত্ব"—(পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৭ পৃঃ) তবেই তো কেবল বিদেশীয় নয়, ওদের দেশের লোকেরাও যদৃচ্ছা পোষাক পরিতে পারে না। আহার সম্বন্ধেও বিবেকানন্দই প্রমাণ। তিনি কাঁটাচামচের পরিবর্ত্তে শুধু হাত দিয়া খাইতে চাহিতেন, "প্রথম প্রথম ও দেশের লোকেরা তাঁহাকে শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইত—কারণ ওদেশে কাঁটাচাম্‌চে ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ্ন।" (বিঃ ৫৬৩) তা' হলে স্বাধীনতা কোথায়? বরং এদেশে এইটুকু উদারতা আছে যে, বিদেশীয় যাদৃচ্ছিক আহার বা পোষাক সম্বন্ধে কেহ কুত্রাপি কটাক্ষপাতও করিবে না।

স্বামিজী এদেশে কাহাকেও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত দেখিলে বিরক্ত হইতেন। কতিপয় সিংহলবাসীর ঐরূপ পোষাক দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এরূপ অন্ধ অনুকরণ অতীব হেয়। বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ওসব মোটেই মানায় না।" (বিঃ ৬৩৭ পৃঃ) তিনি আরও বলিয়াছেন— "যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।" (বিঃ ৯১৬) উত্তম কথা। কিন্তু তিনি যখন শেষের বার পাশ্চাত্য দেশ বেড়াইয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁর পোষাকটি কি রকম ছিল? বোম্বাই হইতে কলিকাতার পথে "স্বামীজি ইউরোপীয় পরিচ্ছেদ পরিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে মন্মথ বাবুও তাঁহাকে ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই—ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কি জানি যদি অন্য কেহ হয়।" বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলে বাগানের মালী ছুটিয়া গিয়া মঠের লোকদিগকে সংবাদ দিল, "একো সাহেবো আউচি।" (বিঃ ৯৮০ পৃষ্ঠা)।

তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাও অনেক সময়েই আপত্তিজনক। তিনি বলিয়াছেন 'প্রেতপূজাতেই হিন্দুধর্ম্মের আরম্ভ।

প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাকে আবাহন করিয়া তদুদ্দেশ্যে পূজা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে দৃষ্ট হইল যে, যে সকল ব্যক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তাহারা বড় শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্ত্তে কুশপুত্তলীতে প্রেতানয়নের ব্যবস্থা হইল এবং তাহারই উদ্দেশ্যে পিণ্ড ও পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈদিক যুগের দেবতাদির আহ্বান ও পূজাও তিনি এই প্রেতপূজারই পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।" (বিঃ ৭৯০ পৃঃ)। 'শিবলিঙ্গ' ও 'শালগ্রাম' সম্বন্ধে তিনি (প্যারিসে কোনও এক সাহেবের প্রবন্ধের আলোচনায়) বলিয়াছেন—"বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদসংহিতায় যূপস্তম্ভকে পরব্রহ্মের প্রতিকৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই পরে শিবলিঙ্গের প্রচলন হয়।" এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেও পারিতেন—কিন্তু তাহা নয়, আবার বলিলেন—"পরে হয় তো বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙ্গপূজার পদ্ধতি আরও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল 'স্তূপ' নির্ম্মাণ করিত, তন্মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি স্মরণ-চিহ্ন রক্ষিত হইত এবং ঐ স্তূপকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্রস্তূপাকৃতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ করাতে কালে সম্ভবতঃ ঐ ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারকস্তূপও পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে ও স্মারকস্তূপের প্রতি সম্মান স্তম্ভাকার শিবলিঙ্গপূজায় পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম 'ধাতুগর্ভ।' স্তূপ মধ্যস্থ শিলাকরণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি ভস্মাদি রক্ষণ শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ পূজিত হইয়া কালে বৌদ্ধমতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।" (বিঃ ৯৫৯-৬০)।*

* এইরূপ কথা কোনও সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইলে বরং সহনীয়

স্বামীজি যখন প্রায় জীবনপ্রান্তে পৌঁছিয়াছেন, তখন একদিন তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখ্‌বি খোল করতালই বাজ্‌ছে। * * ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? * * * যে সব musicএ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে।" ইত্যাদি। তবে কি করিতে হইবে, তিনি বলিতেছেন: "ঢাক ঢোল দেশে কি তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মিলে না—ঐ সব গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। * * * ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুল্‌তে হবে "মহাবীর মহাবীর" ধ্বনিতে এবং হর হর বোম্ বোম্ শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত কর্তে হবে। * * * বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার কর্তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে।" ইত্যাদি (বিঃ ১০৪৯—৫০ পৃষ্ঠা)। "খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প করিলে" পেট রোগা হইতে পারে কি না—এ বিষয় ৺গিরিশ ঘোষকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। চৈতন্যলীলায় বোধ হয় তিনি জগাই মাধাই দ্বারা বলাইয়াছেন, সারারাতি কীর্ত্তন করিয়া "ওরা দিনে খাগিয়ে নেয় আর দিস্তার দিস্তা লুচি সাবাড় করে।" বৈরাগী

হইত। একজন সন্ন্যাসিবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারক প্রসিদ্ধ হিন্দুর পক্ষে এরূপ ব্যাখ্যা কিরূপ শোভন—সুধীভির্বিভাব্যম্। (ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা এরূপ আরও অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।)

বর্ণনায় পণ্ডিত কবিও তো বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তন পতনে মল্লশরীরঃ।" আর তূরী ভেরীর আওয়াজে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের—বিশেষতঃ শিশুদের পীলে চমকাইবে না কি? 'কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণে' দেশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়, আর ডমরু শিঙ্গা বাজাইয়া 'মহাবীর' (অর্থাৎ হনুমানজীর) ধ্বনি করিলে দেশটা খুব সাত্ত্বিক হইবে! (হনুমানের রাজসিক প্রকৃতি যে পাইবে—চপল স্বামীজিই ইহার প্রমাণ।) স্বামীজি চান দেশে কেবল একতাল—রুদ্র তালই বাজুক, আর বৈষ্ণব ভাব তিরোহিত হউক! এই কি শেষ 'সমন্বয়'!!

ফলকথা স্বামীজির ভাব স্বভাব সন্ন্যাসিত্বের বিরোধী—তিনি প্রকৃত যাহা ছিলেন—তাহা সন্ন্যাসীর সাজে আবৃত ছিল মাত্র—কিন্তু বাক্যে ও কার্য্যে তাহা সততই প্রকট হইত। সেই সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব।

তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিতেছেন—"তাঁহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস প্রকৃতি অতি সুসমঞ্জসরূপে পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত—একটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব, অপরটী আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎ-রস আস্বাদনের ভাব।" (বিঃ ৯৭ পৃঃ) এটা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বের কথা হইলেও, তাঁহার সমগ্র জীবনেই এই দুইটি ছিল—তবে জীবনচরিতকার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেভাবে নয়। মুখে ও পোষাকে ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসিত্ব, কিন্তু আচার আচরণে পূর্ণ "জগত্রসাস্বাদনের ভাব।" এই দুইটিতে 'সমন্বয়' (?) যদি হয়—তবে এভাবেই হইয়াছে। ত্যাগের মধ্যে এই মাত্রই দেখা যায় যে, তিনি বিবাহ করেন নাই—কিন্তু বিবাহ করিলেই যে সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট—ভোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, এটাও বিবেচ্য।* সাংসারিক কর্ম্ম করিলে তিনি হয়তো একটা দুষ্ট

---

* আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সুরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু সেদিন কোনও প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 'বিসর্জ্জন' শিরোণামে) লিখিয়াছেন "এদেশে সিজার একেকজাণ্ডার নেপোলিয়ন বীর নহেন, এদেশে বীর; বিবেকানন্দ

ত কৌন" (পত্রাবলী ১ম ভাগ—১৩ পৃষ্ঠা) হইতে পারিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসী সাজায় যে ব্রাহ্মণ ও রাজরাজড়ার দ্বারা পদসেবা করান যায় * এটাও আদত কায়েতের ছেলে বিবেকানন্দ বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সাজিয়া বিবেকানন্দ ত্যাগ যে কতটা করিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখা যাউক। চা চুরুট মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ ত চলিতই—'লঙ্কা' প্রিয়তার জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা ওজুহাতও দিতে হইত। এক স্থলে আছে—"লঙ্কামরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য স্বামীজির বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন—পর্য্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশে নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্যই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকেন। আমিও সেই জন্য লঙ্কা খাই।" (বিঃ ২৯৬) আমেরিকার অবশ্যই "নানাপ্রকার দূষিত জল পানের" আশঙ্কা ছিল না—সেখানের ওজুহাত শুনুন—"তিনি তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে, আর কেহ তাহা খাইতে পারিত না। তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া যে দিতেন শুধু তাহাই নহে,

---

স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি। * * * ত্যাগই এদেশে বিজয়ী"। অমৃত বাবু, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে এভাবে (বিবেকানন্দের সঙ্গে—তাও আবার পরে—নাম গ্রহণ করিয়া) অবমাননা কেন করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এ যে 'শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ'!

* এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও কায়স্থ গৃহস্থ গিরীশ বাবুকে প্রণাম করিয়াছেন (বিঃ ৬৯০ পৃঃ) ও নাগ মহাশয়কে পত্রে 'অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ' জানাইয়াছেন (পত্রাবলী ১ম ভাগ ১০ পৃঃ) এবং সাক্ষাৎকালে প্রণাম (বিঃ ৯১৮ পৃঃ) করিয়াছেন। [এই নাগ মহাশয় সম্বন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের মত মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।' (বিঃ ৯২৫ পৃঃ) অথচ পাওহারিবাবা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "রামকৃষ্ণ দেবের পরই পাওহারি বাবার স্থান।" (বিঃ ৮৫১ পৃঃ) তবে কি নাগ মহাশয় পরমহংস ও পাওহারি বাবা অপেক্ষাও বড় ছিলেন?]

অনেক সময়ে দেখিতেন ওদেশের জিহ্বার কতটা ঝাল মসলা সহ্ হইতে পারে। তিনি বলিতেন যে, ঐসব ঝাল মসলা তাঁহার লিভারের পক্ষে ভাল। বস্তুতঃ কিন্তু ঠিক্ তার বিপরীত। তবে তাঁহার মুখে ভাল লাগিত বলিয়া তিনি ঝাল দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না।" (বিঃ ৫৬৬ পৃঃ)। [তাঁহার জীবনচরিতলেখকও এখানে কি বলিতেছেন, দেখুন।] আর ঝাল খাইবার জন্য আগ্রহ কত, সুইজার-ল্যাণ্ডে লুসার্ণ হ্রদের ধারে তিনি একদিন খুব ঝাল লঙ্কা দেখিতে পাইলেন। পাশ্চাত্য দেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন নাই। তাঁহাকে কতকগুলি কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে দেখিয়া বিক্রেতা অবাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু তিনি মহাপরিতৃপ্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এর চেয়ে ঝাল লঙ্কা আছে ?' (বিঃ)। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণ-রুক্ষবিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ১৭। ৯

স্বামীজির প্রকৃতি ইহা হইতেই ধরা পড়িতেছে—রজোগুণ তাঁহাতে প্রবল ছিল—তাই "গায়ের জোরের" কথা এত শুনিতে পাই। সংযম অভ্যাস সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কিন্তু সামান্য 'ঝাল' বা 'লঙ্কা' খাইবার প্রকৃতিটা দমন করিতে পারিলেন না ! মেথরের হাত হইতে কল্‌কে নিয়া তামাক খাবার গল্প শুনিয়া নাটককার গিরিশঘোষ বলিয়াছিলেন— "তুই গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কল্‌কে টেনেছিলি !" (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) স্বামীজি অবশ্য অন্যরূপ জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় গিরিশ বাবুই ঠিক্ বলিয়াছিলেন। কেননা এডেনেও তিনি এক হিন্দুস্থানী পানওয়ালের কাছে গিয়া "ভেইয়া তোমারা ছিলুমঠো দো" বলিয়া কলিকা লইয়া ফুঁক্ দিতে টানিয়াছিলেন * (বিঃ ৬২৫পৃঃ) চামারের প্রস্তুত রুটি খাইবার ওজুহাত দিয়াছিলেন—'সে সময়ে আমি

* জীবনচরিতকার অবশ্য ইহাতে 'অমায়িকতা' মাত্রই দেখিতে পাইয়াছেন—তাই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে অগ্নিস্পর্শ করি না।' (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) কিন্তু চুরুট—তামাক্ 'সে সময়' ছাড়িয়াছিলেন কি? তাহাতে তো অগ্নিস্পর্শ হইত। জুনাগড়ে তো "তিনি রন্ধনাদি কার্য্যে সুপটু ছিলেন—এবং অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন।" (বিঃ ২৬৫ পৃঃ) এইরূপ তিনি মহীশূরে বলিয়াছিলেন—"রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি পরিব্রাজক অবস্থায় অর্থস্পর্শ বা কোনও দ্রব্য সঞ্চয় করিব না।" তবে কি আমেরিকা ইত্যাদিতে যাওয়ার কালে 'পরিব্রাজক অবস্থা'টা ঘুচিয়া গিয়াছিল? কেননা যাবার সময় তাঁহার নিকটে যে অর্থ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইয়াছিল, সেটা পত্রাবলী হইতেই জানিতে পারা যায় (প্রথম ভাগ ৪ নং পত্র দ্রষ্টব্য)। আমেরিকায় তো বক্তৃতা দিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেলুড়মঠ নির্ম্মাণে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। (বিঃ ৮০৬ পৃঃ)।

বিলাসিতার ভাব তাঁহার জীবনে বহুশঃ দেখা গিয়াছে—অন্ততঃ একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপটা অবাঞ্ছনীয়। যখন শ্রীযুত হরিপদ মিত্রের আবাসে (বেলগাঁওয়ে) গেলেন, সঙ্গীয় জিনিস মধ্যে একখানি মাত্র পুস্তক ছিল—সেখানি ফরাসী সঙ্গীতসম্বন্ধীয়। (বিঃ ২৯১ পৃঃ) ফরাসীদের সঙ্গীতে বৈরাগ্যের উদ্দীপক উপাদান আছে কিনা জানি না। নবেলের প্রেম কাহিনীতে যে বিলক্ষণ রুচি ছিল * তাহা তাঁহার কথা হইতেই জানিতে পারি—"তোমরা কি জানো যে, আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্য্যন্ত পড়তে পারি না" (বিঃ ৬২৫) এই উক্তি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময়ে—বোধ হয় ১৩০৪ সালে। তিনি "রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহার (নটুকৃষ্ণ নামক শিষ্যের) নিকটে একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা

* তিনি এই লেখকের নিকটে ফ্রেঞ্চ নভেল পড়িবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ("আসামে বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ] দ্রষ্টব্য।) তখন জীবনের প্রায় শেষ ভাগ (১৩০৮ বৈশাখ)।

করায় উনি (নটুকৃষ্ণ) বলিয়াছিলেন, "কি গুরুজি বিলাস ঢুকেছে নাকি?" (বিঃ ৭৮৫ পৃষ্ঠা)। 'বিলাস' আমেরিকায় নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ তার সময়েও দেখা গিয়াছে—তথায় প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন। আমেরিকায় নাকি কানাডা ব্যতীত আর কুত্রাপি ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া গাড়ী নাই। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সুতরাং আমাকে ফার্ষ্টক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে * * আমি কিন্তু উহার পুলম্যান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না।" কারণ পত্রেই ছিল,—"এগাড়ীতে (ফার্ষ্ট ক্লাস) বড়ই আরাম * * * তুমি যেন হোটেলেই আছ, বোধ করিবে; কিন্তু বেজায় খরচ।" (পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৫ পৃষ্ঠা।) ভ্রমণকালে রাজা রাজড়াদের অতিথি হইয়া "রাজকুমারদের সহিত অশ্বারোহণ বা অন্যান্য ক্রীড়ায় যোগ দিতেন।" (বিঃ ২৭৪ পৃঃ)। ইউরোপ আমেরিকায় স্ত্রীলোক-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করিয়াছেন—ফ্রান্সে অভিনেত্রী ও গায়িকার সঙ্গে কেবল ঘনিষ্ঠ পরিচয় নহে—পরন্তু গায়িকার সঙ্গে একত্র ভ্রমণও করিয়াছেন। (বিঃ ৯৭১ ও ৯৭৯ পৃষ্ঠা)। আমেরিকায় নাকি তাঁহাকে "সভ্যসমাজের রীত্যনুযায়ী কখনও কখনও নৃত্য করিতে হইয়াছিল; তিনি ওদেশের নাচের অনেক বোলও শিখিয়াছিলেন!" (বিঃ ৭৭ পৃঃ ফুটনোট্।) ধন্য বিবেকানন্দ! তুমি না গিরিশ ঘোষকে বলিয়াছিলে "ঠিক ঠিক সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহাকঠিন, কথায় ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই।" (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) আর তোমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস তো ভূয়োভূয়ঃ স্ত্রীলোকের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। "সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখিবে না। * * * সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হইলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিবে না—ভক্ত স্ত্রীলোক হইলেও বেশীক্ষণ আলাপ করিবে না।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ—৯৯ পৃঃ।*

* আমেরিকায় বিবেকানন্দসম্বন্ধে একটা কুৎসিত অভিযোগ উঠিয়াছিল যে,

ফলতঃ বিবেকানন্দের সন্ন্যাসধর্ম্ম একটা বাহ্য আবরণ মাত্র। সন্ন্যাসী শোক দুঃখে অবিচলিত—স্তুতিনিন্দায় নির্বিকার হইবেন। এদিকে ফচ্‌কে হওয়াও অনুচিত। কাশ্মীরে ভ্রমণের সময় একজন তাঁহার ফষ্টি নষ্টি বা চাপল্য দেখিয়া আপত্তি করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আমরা জ্যোতির সন্তান, আনন্দের তনয় আমরা কেন মুখ অন্ধকার করে থাকবো' (বিঃ ৮৭০-৭১ পৃঃ) অর্থাৎ চাপল্যেই কেবল উজ্জ্বলমুখ হয়। প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগকারী মহাত্মগণের বদনে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি ফুটিয়া উঠে—তাহাই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফষ্টি-নষ্টিতে চিত্তবিক্ষেপই সূচিত হয়। এদিকে বলরাম বাবুর মৃত্যু সংবাদে যখন স্বামীজি রোদন করিতেছিলেন—তখন এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোকপ্রকাশ অনুচিত।" তখন এই তার্কিকচূড়ামণি বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জ্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। * * * * * * যে সন্ন্যাসে হৃদয়কে পাষাণ কর্ত্তে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" (বিঃ ২০৩-৪ পৃঃ) 'গ্রাহ্য' যে করেন নাই—ইহাই ঠিক্! এদিকে বেলুড়মঠ স্থাপিত হইলে "নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচারব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন।* "চলন্তি নৌকায় আরোহিগণ বেলুড়মঠ

তিনি কোনও গৃহস্থের এক পরিচারিকার সঙ্গে 'অসংযত আচরণ' করেন (বিঃ ৫৬৯ পৃঃ) কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলা মেশা হইতেই এই অপবাদ উদ্ভূত হইতে পারিয়াছিল। "মৃষা বা সত্যং বা হরতি মহিমানং জনরবঃ।"

* না-ই বা করিবেন কেন? "মঠে পাঁউরুটি প্রস্তুতের জন্ত স্বামীজি বিবিধ প্রকারের খামির লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ

দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে * * * কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু স্বামীজি বলিতেন—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকায়ে হাজার।

সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার।" ইত্যাদি।

(বিঃ ১৬৮ পৃষ্ঠা)

বেশ কথা। কিন্তু কাজে কি হইল? মঠে প্রতিমা আনিয়া যথাবিধি দুর্গোৎসব করা হইল—"বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়ার পরিচিত, অপরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; * * তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা হিন্দু সন্ন্যাসী" (১০৪১-৪২ পৃঃ) 'অভীঃ' মন্ত্রের প্রচারক অবশেষে লোকবাদের নিকট মাথা নুয়াইলেন! *

এখন এই আলোচনার উপসংহার করিতে হইবে। যে জীবনচরিত-খানি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে—তাহাতে অত্যুক্তিবাদ বহু আছে—এবং জীবনচরিতে এরূপ থাকেই। তবে এ সকলের অনেকগুলিই প্রতিবাদযোগ্য; কিন্তু প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি ভয়ে কেবল একটিমাত্র (নমুনা স্বরূপ) দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। স্বামীজি আল্‌মোড়ায় হিন্দী ভাষায় একটী বক্তৃতা দেন; তদুপলক্ষে চরিতকার বলেন, "হিন্দী ভাষাও সুললিত বক্তৃতা-প্রদানোপযোগী বলিয়া পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না।" ইত্যাদি (বিঃ ৭৫৬ পৃষ্ঠা)। আর

পুনঃ অকৃতকার্য্য হইলেও চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। (বিঃ ১০৫০ পৃঃ) নামে মঠ, কিন্তু 'পাউরুটি' প্রভৃতি খাওয়া চাই!

* তিনি একদা সিষ্টার নিবেদিতার দ্বারা এক ছিলিম তামাকু সাজাইয়াছিলেন—কেন না কোনও কোনও লোকের ধারণা ছিল, "তিনি নাকি শ্বেতকারদিগের স্তুতি ও ছন্দানুবর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগকে আপন শিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (বিঃ ৯২৬ পৃঃ) দেখুন, 'সাধুন্ কো দুর্ভাব নেহি' কত দূর!

কাহারও কথা আমি বলিতে পারিব না,—কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবেই অবগত আছি যে, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালী হইয়াও হিন্দী ভাষায় অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার ঐ ভাষায় উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিবেকানন্দ শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই—এবং তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ ছিল। বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং তর্কশক্তি খুব প্রখর ছিল। ইংরাজীতে তাঁহার অসামান্য দখল ছিল,—সংস্কৃতেও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। নানা বিষয়েই তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন—বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। এরূপ ব্যক্তি কালাপানি পার হইয়া তাঁহার পূর্ব্বে ইউরোপে ও আমেরিকায় অতি কমই গিয়াছেন। অতএব ঐ সকল দেশে তাঁহার নাম যশঃ হওয়া প্রত্যাশিত বিষয়ই ছিল। তিনিও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ঐ সকল দেশে সীমাবদ্ধ রাখিলে, আমার বোধ হয়, জগতের সমধিক উপকারই হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকা নহে যে, এখানে তিনি যাদৃচ্ছিক-ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন—আর লোকে তাহা 'নূতন একটা কিছু' বলিয়া গ্রহণ করিবে। এদেশে 'বেদান্তের' বাণী অনেকশঃ নানাভাবে শ্রুত হইয়াছে। এখানে তিনি যাহা প্রচার করিবার জন্যতঃ অধিকারী ছিলেন এবং রজোগুণাধিক্য যাতে দরকার—তাহা ছিল 'রাজনীতি'; এবং তিনি স্বয়ং যাহাই বলুন না কেন * তাঁহার দ্বারা পাকে প্রকারে 'রাজনীতির' ভাবই প্রচারিত হইয়াছে। প্রবন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বোঝা যাইবে—তিনি (এদেশে অন্ততঃ) ধর্ম্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণের অনধিকারী ছিলেন।

* কাপুরুষতা কি রাজনৈতিক বাঁদরামির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না।" ইত্যাদি (শিষ্যদের নিকট লিখিত পত্র)—বিঃ ৫২৫ পৃঃ।

তবে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্কুল কলেজের ছেলেরা কোনও রূপ ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা পায় না—তাই ধর্ম্মের নামে যাহাই খুব চোট্‌পাটের সহিত শুনে বা পড়ে, তাহাই অবিচারিতভাবে গ্রহণ করে—বিশেষতঃ ইউরোপ আমেরিকা দিগ্বিজয় করিয়া দু'একজন সাহেব বিবি শিষ্য করিয়া বিবেকানন্দ তাহাদের তরুণ হৃদয়ে তৎপ্রতি একটা প্রশংসানুরাগের ছাপ ম্যারতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অপিচ তরুণবয়স্কদের ভাবপ্রবণ চিত্তে বিচারক্ষমতা স্বল্প থাকায়— তাঁহার সমগ্র লেখা ও বক্তৃতায় যে পরস্পর বিরোধী নানা বিষয় আছে, তাহা উহারা ধরিতে পারে না—শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকায় তাঁহার উক্তির অশা-স্ত্রীয়তাও বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তে বিবেকানন্দভক্ত অনেক বালক এবং বালকোপম যুবক ও প্রৌঢ় দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সময়েও এইরূপই ঘটিয়াছিল। সেই স্রোতঃ যেমন ফিরিয়াছে, আশা করি ভগবদিচ্ছায় এই বিবেকানন্দী মোহও ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। এই আশয়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশে অধ্যবসায়ী হইয়াছি।

বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন—আমরা যদি আবেগবশতঃ তাঁহার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটু বলিয়া থাকি, আশা করি তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে।

প্রথম পরিশিষ্ট।

ক। "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি"—

প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর।

বিগত ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ যুগ্মসংখ্যক "সাহিত্য" পত্রে "৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহোদয়ের একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অবস্থা কতদূর কি ছিল, এই বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয় কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের অনেক ভক্ত ঐ সব কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেহ মৌখিক আলাপে, কেহ চিঠি দিয়া এবং অপরে (স্বনামে এবং বে-নামেও) প্রবন্ধ লিখিয়া স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইহাদের উক্তির অধিকাংশই গালাগালি ও বাজে কথায় পরিপূর্ণ, তথাপি যে সকল কথাতে কিঞ্চিৎ যুক্তির আভাস আছে—বিশেষতঃ রাঁচির শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সাহিত্য আষাঢ় ১৩২৮) যে সকল শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা রহিয়াছে, সেইগুলির প্রতি আমি শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। অপিচ, চূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্য ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত "বেদব্যাসে" পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল—

---

* ইহাই এই গ্রন্থের "প্রথম পরিচ্ছেদ"।

সেগুলি পশ্চাৎ সংগ্রহ করিয়া * পাঠ করাতে দেখিলাম, তন্মধ্যে উল্লেখিত কতকগুলি কথা চূড়ামণি মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত অভিমতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। আমি ঐ সকল কথার প্রতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করি, কেননা তথ্য প্রকাশই আমার অভিপ্রায়। উত্তরে চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে যে চিঠিখানি পাইয়াছি, তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

৺সদাশিবঃ শরণং ।

পরম স্নেহাস্পদ !

আপনার ৩০শে শ্রাবণের পত্রখানা যথা সময়ে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন আমার দৌহিত্রটী টাইফয়েড্ জ্বরে পীড়িত থাকায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলাম, আবার সে একটু সুস্থ হইলে নিজেও অসুস্থ হইয়াছিলাম। এজন্ত আপনার পত্রখানির উত্তর দিতে অসমর্থ ছিলাম। সম্প্রতি ৺ কৃপায় সে সব ঝঞ্ঝাট্ সারিয়াছে, তাই অদ্য উত্তর দিতেছি।

লোকের তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা আর কি লিখিব। সে যাহার যেমন ইচ্ছা হয় করুক, তাহা তাহার মুখ আর হৃদয়েই থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার বা আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহাত্মা ৺ রামকৃষ্ণ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই বিদিত করিয়াছি। তাঁহার মহিমার লাঘব করিবার মানসে কিছুই লিখি নাই; সুতরাং আমার ধারণার মূলে কোন অংশে ভ্রম থাকিলেও আমি পাপী নহি।

৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায় আমার দীক্ষিত শিষ্য, ছাত্র নহে। ভূধর আমার বা অন্ত কোন অধ্যাপকের নিকট কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। যথাসম্ভব অনুবাদাদি পাঠেই সাধারণ ভাবে ভূধরের কিছু জ্ঞান ছিল। অতএব নির্ব্বিকল্পসমাধি, সবিকল্পসমাধি ভূধরেরও

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে [অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে] আমি যে এগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম—তাহা প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে "বেদব্যাস" পাঠের স্মৃতি মাত্র।

বিদিত ছিল না। যেটুকু বিদিত ছিল, তদনুসারেও রামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প-সমাধির উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং দিবসত্রয়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, একথা লিখিত হয় নাই। ৺রামকৃষ্ণের প্রথম অবস্থায় হৃদয়ের শৈশবকাল ছিল। সুতরাং সে স্বয়ং তাঁহার সে অবস্থায় কিছু দেখে নাই। তাঁহার নিজের মুখেও সে একথা শুনে নাই। অন্য লোকের মুখেই শুনিয়া লিখিয়াছে। সাধারণ লোকেরা কতজনেই কত কিছু কথা বলে, সে সকল কথায় যথেষ্ট মূল্য দিলে সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, তবে তিনি তোতাপুরীর নিকট দীক্ষিত বা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এ কথাটা মিথ্যার গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করা অসঙ্গত। তদানীন্তন অনেক লোকেই একথা বিদিত ছিলেন। তাঁহাকে তান্ত্রিক-ভাবের সন্ন্যাস দেওয়াও সত্য হওয়ারই সম্ভব, এবং সেইজন্যই তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহার চিতারোহণাদি অনুষ্ঠান এবং আমার পূর্ব্বলিখিত তাঁহার অন্যান্য আচরণ সেই বিষয়েরই প্রমাণ করে। তদনুসারে তাঁহার গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি হইতে পারে অথবা হইয়াইছিল। 'পরমহংস' সেরূপ কোন উপাধি নহে, উহা সর্ব্বত্যাগী শেষাশ্রমীর সংজ্ঞা। ৺রামকৃষ্ণের সেরূপ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কাজেই তাঁহাকে পরমহংস বলা ঠিক্ নহে। তবে দশজনে যখন পরমহংস বলে, আমিও তাহার অনুকরণে পরমহংস বলিতাম, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। অবধূত আর পরমহংস কথার অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রায় এক হইলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী আর বন, পর্ব্বত, সাগর, এই ছয়দলের তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণের অবধূত সংজ্ঞার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী পুরীর শিষ্য, সুতরাং তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতে অবধূত, ইহা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু অবধূত গীতার প্রকৃত অবধূত নহেন। তৎকালের "বেদব্যাস" পত্র বা

"সাধুদর্শন" আমার নিকট নাই বা পাইবার উপায় নাই; সুতরাং তাহা আমার দেখা অসম্ভব। রামকৃষ্ণের ভক্তিগদগদ অপূর্ব্বভাব দেখিয়া আমি আনন্দিত হইতাম, ইহা এখনও বলিতেছি এবং উহা যে অসাধারণ, তাহাও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত, ইহা আমি কখনও বলি নাই, ইহা নিশ্চয়।

"বেদব্যাসে" আমার যে সকল কথা প্রকাশিত হইত, তাহাই আমি দেখিতাম। ভূধর বা অন্যের লেখা দেখি নাই বা অনুসন্ধানও করি নাই।* আমি বেদব্যাসের সম্পাদক ছিলাম না।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত কেবল গুরুর নিকট দুই চারিটী কথা শুনিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, অথবা জ্ঞান হইতে পৃথগ্‌ভূত ভক্তিনামক কোন কিছুর দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা নিরর্থক বা উন্মত্তের অনুষ্ঠান মধ্যে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আর উপনিষদ্ অধ্যয়ন এবং মননশাস্ত্র শিক্ষার পর যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া যে গুরুর নিকট যোগ শিক্ষা করার উপদেশ শাস্ত্রের অসংখ্য স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রলাপ মধ্যেই পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতোক্ত ভক্তিও কেবল সত্ত্বশুদ্ধিরই কারণ এবং সত্ত্বশুদ্ধি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত মুক্তির কারণ, ইহা ভাগবতেই (২য়ঃ প্রথম স্কঃ) লিখিত আছে। এজন্য ভাগবতও অধ্যাত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার কথায় পরিপূর্ণ, সুতরাং ভাগবতের মতেও জ্ঞান ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি জীবকে কৃতার্থ করিতে পারেন না। অনধীতশাস্ত্র কোন লোক যে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টান্তও নাই। সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করা

* বেদব্যাস ৩য় বর্ষ ১ম অধ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (২য় পৃষ্ঠায়) ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায়ও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

মাত্রেই যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা তাহাদের পরিচয় না থাকিলে, সে কোন্‌টি ধরিবে, কোন্‌টি না ধরিবে, যে ঈশ্বরতত্ত্বের দিকে গেল, কি অন্য তত্ত্বের দিকে সরিয়া পড়িল, এবং তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হইতেছে, উহা কোন্ লক্ষণের অন্তর্গত, কিংবা উহা সত্য বা ভ্রমদর্শন, ইহা কি প্রকারে বুঝিবে? তবে যদি গুরু তৎসমস্তই শিষ্যকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে সাধক যথানিয়মে উঠিতে পারে, ইহা সত্য; কিন্তু সেরূপ শিক্ষাতো অধ্যয়নের নামান্তর। তাহা ২।১ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আর নিরক্ষর লোকের অত কথা মনে রাখাও সম্ভবপর নহে; কাজেই শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, আজকাল এমন গুরুর অসদ্ভাব নাই, যিনি ৫৲ টী টাকা দক্ষিণা পাইলেই অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে ভ্রূর ঊর্দ্ধভাগে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ব্রহ্ম দর্শন করাইয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনে কোনরূপ অধ্যয়নেরই প্রয়োজন নাই। উহা অন্ধগণেরই ব্রহ্ম এবং তাহাদেরই সন্তোষাবহ। ঐ শ্রেণীর গুরু এবং ঐ শ্রেণীর শিষ্যগণই শাস্ত্রাধ্যয়ন বা জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী এবং তাহারাই আত্মসম্মান বা আত্মতুষ্টি রক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাদির অকিঞ্চিৎকরতা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, রীতিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত জীবের ব্রহ্মরাজ্যে বা অধ্যাত্মরাজ্যে আরোহণ করা গগনকুসুমের ন্যায় অসম্ভবপর।

আমি একথা কখনও ভাবি নাই যে, যথারীতি যোগানুষ্ঠানাদি না করিয়া বিবেকবৈরাগ্যাদিশূন্য লোকের কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই কৃতার্থতা হয়; কিন্তু শুভাদৃষ্ট থাকিলে শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বীজসমাধি হইয়া কৃতার্থতা হইতে পারে, অজ্ঞের পক্ষে তাহা অসম্ভবপর, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

কি অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ, কি শাস্ত্রীয় বিদ্যা, ইহার কোন বিষয়েই আমি আমাকে, ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা উচ্চলোক বলিয়া এখনও মনে করি না। বরং বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচত্বাদিরই অনুভব করিতেছি। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্রারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদেবতার কৃপায় নিশ্চিন্ত নানাদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছি, একথা সত্য এবং যাঁহারা তাহা করেন নাই, তাঁহাদের তুলনায় এ অংশে আমি একটু অগ্রসর। আর তাঁহারা সেই অরণ্য হইতে দূরে অবস্থিত। এরূপ ধারণা যদি দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা বা অহঙ্কারের নামান্তর হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি এ অংশে অপরাধী। কিন্তু শাস্ত্র এ ধারণাকে তাহা বলে না। শাস্ত্রমতে ইহা স্বরূপ জ্ঞানমাত্র। যে ভাবটি অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া নিজকে স্ফীত করিয়া তোলে, তাহাই অহঙ্কার বা দম্ভাদির অন্তর্গত। অতএব, "আমি ২৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছি, আর ৺রামকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, ইহা তাঁহার বিদিত ছিল", এইরূপ বলা শাস্ত্রের মতে দাম্ভিকতাদিমূলক নহে। অধিক আর কি লিখিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীশশধর শর্ম্মা। *

এই চিঠি পাইয়া শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে আমি দুএকটি কথা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মের প্রভূত সুকৃতি থাকিলে পরজন্মে সাধক অল্পকাল মধ্যেই অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন—যেমন ধ্রুব প্রহ্লাদ শুকদেব প্রভৃতি হইয়াছিলেন; ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসও হয়তো সেইরূপ কারণেই অল্পায় সময়ের সাধনায়ই নির্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়াছিলেন; ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? আপিচ জীব গণের শোচাংশে চূড়ামণি মহাশয়

---

* চিঠিখানিতে তারিখ নাই; ইহা ২রা আশ্বিন (১৩২৮) আমার হস্তগত হইয়াছিল।

লিখিয়াছেন, "বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতা এবং নীচতাদির অনুভব করিতেছি;" ইহা তাঁহার বিনয়াতিশয় মনে করিয়া, পত্রখানি প্রকাশ করিবার সময়ে, ঐ বাক্যটি ছাড়িয়া দিতে অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এ সকলের উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় আর একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

৺সদাশিবঃ শরণং

বহরমপুর ২৪।৭।২৮

পরম স্নেহাস্পদ!

আপনার পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। নানা ঝঞ্ঝাট্‌বশতঃ এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি এই পত্রে যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার যাহা বিবেচনা তাহা জানাইতেছি।

অবধূত রামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত কি না, তাহার সমর্থন ও অসমর্থন এই উভয় পক্ষেরই প্রমাণ সুদৃঢ় নহে; তবে যতটা দেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই বলিয়াছি এবং এখনও তাহাই বলিতেছি। তবে যদি আমার বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে আর সত্য সত্যই তিনি নির্ব্বিকল্পসমাধি ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পরমানন্দের বিষয়। তিনি শুক নারদাদির মত মুক্তপুরুষ হইলে বা তাঁহার অনন্ত যশঃকীর্ত্তি ও মহিমা প্রকাশ হইলে আমার পৈত্রিক বা নিজ সম্পত্তির কোন হানি হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে আমার দুঃখিত হওয়া বা তাহার অপলাপের জন্য আমার চেষ্টার কোন কারণ নাই। সমাজে যত বড় লোক হয়, ততই সমাজ ও দেশের উন্নতি, ইহা আমি সম্যক্ বিদিত আছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের

* যাঁহার দ্বারা এ চিঠি লিখান, তিনি যত বর্ণাশুদ্ধি, ইত্যাদি করাতে সংশোধনপূর্ব্বক ইহা প্রকাশিত হইল।

জ্ঞানবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহি। ৺ রামকৃষ্ণকে আমি কিরূপ জানিতাম, তাঁহার সহিত আমার কিরূপ কথাবার্ত্তা হইত—ইহাই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়। সুতরাং আমি যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি। ইহাতে যদি তাঁহার অনুগত লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করেন, তবে করুন, আমি সেই ভয়ে সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। এজন্য এবারও আমার বিশ্বাস অনুরূপ লেখাই লিখিতেছি।

নির্ব্বিকল্পসমাধিতে অধ্যাত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু এই উভয় বিষয়েরই কোন কথা তাঁহার নিকট শুনিতে পাই নাই। তাঁহার কথা বলিয়া যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত বিষয়ের কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি লেখা পড়া জানিতেন না বলিয়া সে বিষয়ে উপনিষদাদি কোন গ্রন্থ তিনি পড়িতে পারেন নাই, তবে যদি কাহারও উপদেশে ২।১ দিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগানুশাসন আয়ত্ত করিয়া সমাধির অসংখ্য স্তর কাটাইয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া কেহ সন্তুষ্ট হন, তবে সে বিষয়ে আমি কি বলিব? তাঁহাদিগকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্রহ্মবিদ্যাদি ও সমাধিব্যাপারের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতে বোধ হয় তাঁহারা সুযোগ পান নাই, সেইজন্য ঐরূপ বলিতে সাহস করিতে পারেন। ধ্রুব বহুদিন পর্য্যন্ত অনশন ব্রতাদি করিয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত আরাধনা দ্বারায় ভগবৎকৃপাভাজন হইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দ্বারায় মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গবিশেষে (ধ্রুবলোকে) গমন করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতেই লিখিত আছে। কিন্তু মুক্তির তুলনায় সে স্বর্গ নরকবিশেষ। প্রহ্লাদও যাবজ্জীবন আরাধনা দ্বারায় স্বর্গবিশেষেই গমন করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিত আছে। শুকদেবও জন্মাবধি বহু বৎসর পর্য্যন্ত পিতার নিকট ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা ও যোগাভ্যাসাদি করিয়া-

ছিলেন, এবিষয় শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে। তাহাতে তাঁহার বশীকার বৈরাগ্য হইবার কথাও পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির কথা লিখিত নাই। অতএব পূর্ব্বজন্মের শুভানুষ্ঠান থাকিলেও ২।১ দিন মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা, যোগবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিয়া মানুষ নির্ব্বিকল্পসমাধি-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ধ্রুব বা প্রহ্লাদ নহেন, শুকদেবও নহেন। ধ্রুব প্রহ্লাদের যদি সমাধি হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরবিষয়ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাই ঘটনা দ্বারায় প্রতিপন্ন হয়।

যিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ, তিনি ব্যুত্থানের অবস্থায়ও শারীরিক ও মানসিক পীড়ার দ্বারা পরিবাধিত হন না এবং বাধাবোধ হইলেও তৎক্ষণাৎ সমাধির আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। অতএব তাঁহার নির্ব্বিকল্প-সমাধি হইত, ইহা আমি বলিতে পারি না।

আমি যে ক্রমেই আমার অজ্ঞতা ও নীচতা অনুভব করিতেছি, ইহা লিখিয়াছি, তাহা বিনয় বা ভদ্রতা প্রকাশের জন্য নহে। উহা আমার বিশ্বাসমতেই লিখিয়াছি। বিদ্যা, মহাবিদ্যা জ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলি জগদম্বারই নামান্তর। সত্য, অনন্তও তাঁহারই নাম। সুতরাং বিদ্যা বা জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। যে কোন দিক্ দিয়া যদি বিদ্যাদেবীর অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে মানুষ প্রাণের ব্যাকুলতায় কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেজন্য গর্ব্বিতও হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর, যখন অকূল সমুদ্র দেখিতে পায়, তখন সর্ব্ব গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। তখন বিদ্যাদেবীই যে অনন্ত ব্রহ্মের রূপান্তর, এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয়, সেই সময়ে নিজের অজ্ঞতা না বুঝিতে পারে এমন মানুষ বোধ হয় নাই; কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই পারকূলশূন্য সমুদ্র হইলেও তাহার দিকে অগ্রসর হইতে নিশ্চেষ্ট হয় না।

ইহা মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। আমি এখন সেই দশা ভোগ করিতেছি। জগন্মাতা মহাবিদ্যার অন্বেষণের জন্য এক এক দিক্ দিয়া কতকটা কতকটা অগ্রসর হইয়া যতদিন তাঁহার প্রকৃত সংবাদ কিছুই জানিতাম না, ততদিন তাঁহার চরণসংস্পৃষ্ট এক একটু বায়ুমাত্র দূর হইতে স্পর্শ করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া বৃথা আনন্দানুভব করিতাম। এখন কতকপরিমাণে হিজিবিজি, কাঁটা জঙ্গল ছাড়াইয়া একটু আলোকের ভাব পাইয়া বিদ্যামূর্ত্তির অসীমতার একটু আভাস বুঝিতে পারিয়া, সেই মিথ্যা দম্ভ হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর নিজের অজ্ঞতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রাণের ব্যাকুলতা বশতঃ সেই অকূল সমুদ্র লক্ষ্য করিয়াই প্রাণের সর্ব্বশক্তি সমর্পণ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বিদ্যামূর্ত্তির কোন অংশই পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং আমি অজ্ঞ, ইহা সত্য।

আমি নীচও বটে। যতদিন দৈহিক অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাইতাম, ইহার বাহিরে নিজের জীবাত্মার মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না, ততদিন আত্মবিষয়ে নিদ্রিতবৎ তমসাচ্ছন্ন ছিলাম। সুতরাং আমি ভাল কি মন্দ, সুস্থ কি অসুস্থ, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন বহুকষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় আবর্ত্ত বা কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অনেক সময় নিজের জীবমূর্ত্তি দেখিতে পাই। দৈবিক প্রবৃত্তি বা আসুরিক প্রবৃত্তি কি তাহার কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং এখন দেখিতে পাই, আমার নিজের জীবশরীর অসংখ্য আসুর বা অপবিত্র প্রবৃত্তির ব্রণগুলি পচিয়া অতি দুর্গন্ধান্বিত ও অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছে। সুতরাং আমাকে আমি অতি নীচ ও অতি দুঃখী ব্যতীত কি বুঝিব?

সত্য কথাই আপনার নিকট লিখিয়াছি। ৺ নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমি এই জন্মেই এই ব্যাধিগুলির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পারি। আমি স্বয়ং লিখিতে ও পড়িতে পারি না, ইহা বিদিত আছেন। অন্য-

দ্বারায় লিখিতে ও পড়িতে হয়; সুতরাং অধিক আর লিখিতে পারিলাম না। এখানে দৈহিক একরূপ কুশল। আপনার কুশলাদি লিখিয়া সন্তোষিবেন, ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশশধর শর্ম্মা।

পূজ্যপাদ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই পত্রখানি পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রীক দার্শনিকপ্রবর সক্রেটিস্‌কে যখন ডেল্‌ফির দৈববাণী "জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন "দেববাক্য অব্যর্থ, সন্দেহ নাই; তবে আমি একটা কথা জানি যে আমি কিছুই জানি না, অন্যেরা হয়তো ঐটা জানেন না।" ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন মৃত্যুর প্রাক্‌কালে বলিয়াছিলেন "জ্ঞানসমুদ্রের বেলা ভূমিতে দু একটা উপলখণ্ড মাত্র সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি—অসীম অনন্ত রত্নাকর পুরোভাগে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।" শ্রুতি বলিয়াছেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

—তাই বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যিনি শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন—যাঁহার সাধনপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হইয়াছে, সেই ষড়্‌দর্শনবেত্তা বিদ্বচ্চূড়ামণি শাস্ত্রাচারপূত বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ স্বকীয় আধ্যাত্মিকী অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই শ্রদ্ধার বিষয়—তাহাতেই তাঁহার নিষ্কপট সত্যসন্ধতা প্রমাণিত হইতেছে—প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক তদুপরি কটূক্তি বর্ষণ ব্যর্থ হইতেছে।

চূড়ামণি মহাশয়ের চাপ্‌রাশ সম্বন্ধীয় কথায় অস্বীকার মিথ্যা বলিতে গিয়া বাবু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, "তবে আশঙ্কা হয় ঐ প্রশ্ন (চাপ্‌রাশ আছে কি না) স্বকর্ণে শুনিয়াছেন পরমহংসের শিষ্যগণ ব্যতীত এমন ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও জীবিত

আছেন, এ সংবাদ শুনিয়া চূড়ামণি মহাশয় লজ্জিত হইবেন।" * সত্যেন্দ্র বাবু যদি যথার্থ সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক হইতেন, তবে সেই জীবিত ব্যক্তিটির নাম ধাম প্রকাশপূর্ব্বক সত্যানুসন্ধানের উপায় করিয়া দিতেন—তা না করিয়া কটূক্তি বর্ষণপূর্ব্বক নিজেরই পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ের ছেলে ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বে-আদব ছিলেন না ইহা নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়াছিলেন, সেই বাড়ীর বাসিন্দা ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায় ঐ দিনকার ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সুধীবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল যে ঐ প্রশ্ন হয় নাই, এমন নহে—তাদৃশ প্রশ্নের কোনও অবকাশই ছিল না।৬ "বেদব্যাস" ২য় খণ্ড (১২৯৪) ১০ম সংখ্যা হইতে ৺ ভূধর বাবুর প্রবন্ধের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"একদিবস আচার্য্যদেব [অর্থাৎ তর্কচূড়ামণি মহাশয়] তাঁহার কলিকাতার আবাসভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবা মাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইতে যাইবেন, অমনি দেখেন, পরমহংসদেব অচৈতন্য—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্য দেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষলোচনে

* সাহিত্য—১৩২৮। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠা।

পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জ্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এ অবস্থায় অতীত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙনিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনের অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে কেন মা। আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা আমায় ভাল করে দে মা।" এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাই শশধর! দেখ্ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমায় বলিলেন যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাহার কাছে যা, গিয়ে দেখা ক'রে আয় গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিলাম না। আমি চলে এলাম। অনেক দিন আসিব আসিব করিতেছিলাম, আজ তা হইয়া গেল।" এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল—কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর দুইজনে নানা ভাব ভক্তিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্য দেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।"* বেদব্যাস ২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড, ২৪০-৪১ পৃঃ।

* ৺ ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধুদর্শন" নামক পুস্তকেও এ সকল কথাই অবিকল আছে, কেন না "সাধুদর্শন" বেদব্যাসে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

১২৯৩ সালে ৺পরমহংসের তিরোভাব—এই প্রবন্ধটি তৎপরবর্ত্তী বৎসরই লেখা হয়। * ৺ভূধর বাবুর প্রবন্ধে পরমহংস দেব সম্বন্ধে তৎসময়ে প্রচলিত অনেক গ্লানিকর কথার প্রতিবাদ আছে—(প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগ—বেদব্যাস ২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা ২৭৪ পৃষ্ঠাবধি দ্রষ্টব্য)। এ অবস্থায় ৺ভূধর বাবুর ন্যায় রামকৃষ্ণ দেবের ভক্তের স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বকর্ণে শ্রুত ঘটনা ও কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। † এখন দেখুন, যিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে "তোমার চাপরাশ আছে কি?" এরূপ প্রশ্ন সম্ভাব্য কি না? কেশব সেন বা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। পরে উঁহাদের মুখের উপর দু'একটা স্পষ্টকথা সরলভাবে বলা এক কথা,—আর-কোনও দিন জানা শুনা আলাপ পরিচয় নাই—এরূপ দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া "চাপরাশ আছে কি না" প্রশ্ন করা অন্য কথা, ইহা অভদ্রতা—পরমহংসদেব তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না নিশ্চয়ই। তবে তিনি যে সব লোকের খপ্পরে পড়িয়াছিলেন, তাঁদের অসাধ্য কোনও কিছুই নাই। ইহারা কয়েকটী কারণেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়। (১) প্রথমতঃ তিনি ব্রাহ্মণ—ইহারা ব্রাহ্মণ-বিরোধী। (২) তিনি সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচারক—ইহারা বর্ণাশ্রমের তেমন পক্ষপাতী নহেন। (৩) তিনি 'পণ্ডিত'—ইহারা

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "কথামৃত" "লীলা প্রসঙ্গ" প্রভৃতি ইহার পরে প্রকাশিত হইলেও ৺ভূধর বাবুর এ সকল কথার কোন উল্লেখ বা প্রতিবাদ এগুলিতে নাই। রামকৃষ্ণভক্তেরা তাঁহার সম্বন্ধে কোথায় কে কি লিখিল, এ সকলের অনুসন্ধান রাখিলে, ইহাও প্রকাশিত হইত।

† বরং উল্লেখিত পরমহংসদেবের বিবরণীতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত-বিরুদ্ধ (যথা 'সমাধি' ইত্যাদি) অনেক কথাও যে আছে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পাণ্ডিত্য-বিরোধী—শাস্ত্রের ধার বড় ধারেন না। (৪) তিনি খাদ্যাখাদ্য বিচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার ইত্যাদি সদাচারের পক্ষপাতী ও প্রচারক—ইহারা হাঁড়িধর্ম্ম, ছুৎমার্গ ইত্যাদি বলিয়া এসকলের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন।* অতএব চূড়ামণি মহাশয়কে "যাব্" করিবার এরূপ প্রয়াস আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে। †

আমাদের এই ধারণার সমর্থনার্থ, এস্থলে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" গ্রন্থে এই "চাপরাশ" সম্বন্ধীয় ব্যাপার কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে:—"এবৎসর (১৮৮৫ খৃঃ) রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্য্যের ‡ সহিত ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তা হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে পণ্ডিতজির [অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের] কথা শুনিয়া এবং তাঁহার বাসা অতি নিকটে জানিতে পারিয়া ঠাকুর শশধরকে ঐদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতজির কলিকাতাগমন সংবাদ স্বামীজি (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন; কারণ যাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণে তিনি ধর্ম্মবক্তৃতাদানে আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত স্বামীজির পূর্ব্ব হইতেই আলাপ পরিচয় ছিল এবং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার বাসভবনে স্বামীজির যাতায়াতও ছিল। আবার পণ্ডিতজির আধ্যাত্মিক ধর্ম্মব্যাখ্যাগুলি ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ বলিয়া ধারণা হওয়ায় তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয়

* এই দলে শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণভক্ত দুই একজন যে না আছেন, একথা আমি বলিতেছি না—অবশ্যই আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা এমনই "মোহগর্ত্তে নিপতিত" হইয়া আছেন যে, এই সম্প্রদায়ের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কীদৃশ অপকার হইতেছে, তলাইয়া দেখিতেছেন না।

† ৺ রামকৃষ্ণকে (এবং তৎসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে) বাড়াইবার জন্য অপর লোকদের খাটো করিবার প্রয়াস "কথামৃত" "লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতিতে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

‡ "কতকগুলি" ভট্টাচার্য্য !!

বুঝাইয়া দিবার প্রয়াসেও স্বামীজির ঐ গমনাগমন এই সময়ে কিছু অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। * স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন এইরূপে স্বামীজি পণ্ডিতজির সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া ঠাকুরকে উহা বলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত দর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজিকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে "চাপরাশ" বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজিকে এই প্রথম দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এই সকল অলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই পণ্ডিতজি কিছুকাল পরে প্রচারকার্য্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যা পীঠে গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।" লীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ২২৩-৪ পৃষ্ঠা।

লীলাপ্রসঙ্গকার কিরূপে অবগত হইলেন যে, পণ্ডিতজি বক্তৃতা ছাড়িয়া ৺কামাখ্যার তপস্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন? চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্মবক্তৃতা প্রসঙ্গেই কামরূপেও আসেন এবং ৺কামাখ্যা দর্শনাদি করিয়া যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়াছেন। ফলতঃ এ সকল লেখক যে কত অসত্য এভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

প্রকৃত পক্ষে রামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের সম্মান যথেষ্ট করিতেন। চূড়ামণি মহাশয়কে অপ্রতিভ করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই লীলাপ্রসঙ্গ-কারের লেখাই উদ্ধৃত করিতেছি—"ঠাকুর। ওগো পণ্ডিত তোমায় দেখলুম। [অর্থাৎ সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তোমার অন্তরে

* এসব কথার মূলে সত্য যে কতদূর তাহা ভগবান্‌ই জানেন। পরন্তু ইহা বিবেকানন্দকেও বাড়াইবার প্রয়াস নয় কি?

কিরূপ পূর্ব্ব সংস্কার সকল আছে, তাহা দেখিলাম—(প্রসঙ্গকারের ফুটনোট)] তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধেবেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে, গামছা খানা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটে গা ধুতে কাপড় কাচতে যায়, আর হেঁসেল্ ঘরে ফিরে না—তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বোলে কোয়ে যে যাবে আর ফিরবে না।" ঐ উত্তরার্দ্ধ ২৩৯ পৃঃ।

'কথামৃত'কারও লিখিয়াছেন, যখন বলরাম বাবুর বাড়ী চূড়ামণি মহাশয় (প্রথম সাক্ষাৎকারের সপ্তাহমাত্র পরে) ৺রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যান, তখন তাঁহাকে—"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) বলিতেছেন—আমরা সকলে বাসর শয্যায় জেগে আছি—কখন বর আসবে।"

(কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১২৬ পৃঃ)

আবার আছে—"পণ্ডিত বিদায় লইলেন। ঠাকুর বল্লেন, এঁকে গাড়ী আনিয়ে দাও। পণ্ডিত। আজ্ঞে না, আমরা অম্‌নি চলে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) । তা কি হয়—ব্রহ্মা যাঁরে না পায় ধ্যানে—" (কথামৃত ঐ ১৩০ পৃষ্ঠা)।

প্রতিবাদী কেহ কেহ চূড়ামণি মহাশয়ের উপর একটী অভিযোগ এই বলিয়া করেন যে, এই দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরে কেন তিনি 'চাপরাশে'র কথার প্রতিবাদ করিতেছেন—অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে কেন প্রতিবাদ করেন নাই। এ বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় বক্তব্য জানাইতে লিখি নাই—লেখা বাহুল্য মনে করিয়াছি। মদীয় পূর্ব্ব প্রবন্ধের সূচনায়ই লেখা আছে যে, তিনি (তিন বৎসর পূর্ব্বে) গৌহাটি আসিলে আমি তাঁহাকে ৺পরমহংস দেবের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি—'চাপরাশ' সম্বন্ধেও তখনই কথা হয়, পরে আমিই নির্ব্বন্ধসহকারে চিঠি লিখা তাঁহার লিখিত বক্তব্য (আমার পত্রের উত্তরচ্ছলে) আনাইয়াছিলাম। চূড়ামণি মহাশয়ের উপরে বহুবিধ অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কিছুর প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া

আমি অবগত নহি। এমন কি, আজ ২।৩ বৎসর হইল ঢাকা হইতে প্রকাশিত "প্রতিভা' পত্রে * দুইবার "৺শশধর তর্কচূড়ামণি" বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখিত হইয়াছিল—তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রতিবাদের উত্তরেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (এতৎসহ প্রকাশিত) পত্রগুলি লেখেন নাই—আমিই বারংবার চিঠি ও তাগিদ দিয়া এগুলি লেখাইয়াছি।

উপসংহারে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের কথায় কিঞ্চিৎ উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন—(সাহিত্য আষাঢ় ১৩২৮ বৈঠকী দ্রষ্টব্য) "তর্কচূড়ামণি মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সদ্ব্যাখ্যাতা, পরন্তু তিনি গৃহী। তিনি গহনে দুর্গম বনে ঘুরিয়া কখনই সাধু সন্দর্শন করিবার তেমন অবসর পান নাই" ইত্যাদি। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় সেই গৌহাটীতে যখন তিনি শেষবার আইলেন, তখনই—এবং তাহাও কয়েক মুহূর্ত্তের মাত্র। তৎকালে আলাপ প্রসঙ্গে, শ্রীহট্ট জেলার জয়ন্তীয়া স্থিত ৺বামজঙ্ঘা-মহাপীঠে গিয়া জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ঐস্থান তখন (১২৯৫ সালে) দুর্গম ও শ্বাপদাকীর্ণ ছিল এবং তিনি যে জীবনে তাদৃশ অনেক বড় লোকের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, এ কথাও বলিয়াছিলেন। † ফলতঃ গৃহী হইলেও যাঁহারা তীর্থসেবী, তাঁহাদের সাধুদর্শনের সুবিধা বহুশঃই ঘটিয়া থাকে।

এ সকল প্রতিবাদের উত্তরচ্ছলে আমার নিজের বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

---

* ১৩২৬ সাল—৪১ পৃঃ ও ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীজয়ন্তী মহাপীঠ এবং উক্ত সাধু (ব্রহ্মচারী রাজ প্রসাদ) সম্বন্ধে পত্রান্তরে (ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৮ পৌষ সংখ্যায়) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত ঐ সাধু দর্শন বিষয়ে একখানি চিঠিও প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম পরিশিষ্ট।

খ। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ

বিষয়ক প্রসঙ্গের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম, সে গুলির প্রতিবাদ হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত চিঠিতে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যে সব কথা ছিল, তৎপ্রতিবাদের উত্তর পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে; ঐ প্রবন্ধে চূড়ামণি মহাশয়ের পক্ষ হইতে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার কথার যে প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বপ্রবন্ধেই বলিয়াছি, প্রতিবাদগুলির অধিকাংশই গালিপূর্ণ। কটু কথা কখনও 'যুক্তি' বলিয়া গ্রাহ্য হয় না—ইহাতে প্রতিবাদীরই পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ কটূক্তি অপ্রত্যাশিত নহে; 'লঙ্কাপ্রিয়' স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিসমূহও খুব 'ঝাল' হইত—তদীয় অনুবর্ত্তিগণের ভাষায়ও সেটুকু থাকিবে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যেখানে তর্ক চলে না—প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা যায় না—সেখানে 'গালি' ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?*

পরন্তু রাঁচির শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথোচিত ভদ্রভাবেই তাঁহার প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয়ের বিরুদ্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন—তদুত্তর চূড়ামণি মহাশয়ই দিয়াছেন—আমি এ বিষয়ে কিছুই বলিব না। আমার সম্বন্ধে তিনি যেটুকু লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ৺পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমার

* গালির আর একটা অবান্তর ফল আছে, যুক্তির উত্তরে যে স্থলে কটূক্তিবর্ষণ হয় সেস্থলে "অপমানং পুরস্কৃত্য," সাধারণতঃ কেহ কোনও কিছু বলিতে অগ্রসর হন না, অতএব 'গালি' অনেকটা নিরাপজ্জনক।

মন্তব্য পড়িয়া তিনি বলেন যে, "রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ছিলেন না, এটা আমি 'প্রতিপন্ন করিতে' চেষ্টা করিয়াছি।" একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া দেখিলে বোধ হয় তিনি এভাবে কথাটা বলিতেন না। আমি আমার 'ধারণা' মাত্র বলিয়াছি;—তাঁহাকে আমি 'অবতার' মনে করি না, একথা অবশ্যই বলিয়াছি—এবং ভক্তেরা তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন, একথাও বলিয়াছি; আপচ এইরূপ অবতার বলাতে কিরূপ 'অনিষ্ট' হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সামান্য কিছু বলিয়াছি। ইহাতে তিনি অবতার নহেন—ইহা 'প্রতিপন্ন করার চেষ্টা' বুঝায় না; কেন না কোনও একটা বিষয় 'প্রতিপন্ন' অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ করিতে হইলে যুক্তি দিতে হয়। অবতারের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া একরূপ অসাধ্য। শাস্ত্র যাঁহাদিগকে অবতার বলিয়াছেন—আমরা তাঁহাদিগকে অবতার মানিব—ইহাই একমাত্র 'প্রমাণ' মনে করি। অবশ্য গীতায়—'যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥'

অথবা পুরাণের "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে অবতারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বটে; তথাপি স্পষ্টতঃ যে সকল নাম অবতারের তালিকাভুক্ত, তাহা ছাড়া অপর অবতার স্বীকার করা নিরাপদ নহে। একবার 'অবতার' খ্যাপিত হইয়া পড়িলেই আর কোনও বালাই নাই; তিনি যদি লম্পট হন—নজির হয় "শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ, রাসলীলা ইত্যাদি করিয়াছিলেন"; তিনি যদি শঠ বঞ্চক হন, ভক্তেরা বলিবেন "বামনদেব বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। এ অবস্থায় যুক্তি তর্ক চলে কি? এমন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহারও 'অবতার'ত্ব এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।* অবতারের প্রয়োজনই বা কি? আমাদের

* হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে—"গৌরচন্দ্রিকা" এখন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, তিনি এইরূপ কীর্ত্তনের "গুরু" তখন

তো অনেক অবতারই আছেন—এ ছাড়া—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' বহুবিধই হইয়াছে। রামকৃষ্ণকে যাঁরা গুরুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁহার পূজা করিতে পারেন। আমি লিখিয়াছিলাম, "রামকৃষ্ণের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে—এবং রামকৃষ্ণ এই সকল উদ্ভট শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" ইহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, "বঙ্গদেশে অনেক বহু অবতারের কথা আমরা তো শুনি নাই" তিনি যদি না শুনিয়া থাকেন, তবে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করি। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু-প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, স্বামীজি বলিতেছেন, "এক ঢাকাতেই শুনলুম্ তিন চারিটি অবতার বেরিয়েছেন।" * এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আরো যাহা বলিয়াছিলেন, (পুনরুক্তি হইলেও) তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিলাম। (ঢাকার একজন বালক একটা 'ফটো' দেখাইয়া স্বামীজিকে বারংবার জিজ্ঞাসা করে—ইনি অবতার কিনা? তদুত্তরে) স্বামীজি বলেন "বাবা এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো; তাহলে মাথাটা খুলবে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তোমার মাথার ঘিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।" আবার বলিলেন "গুরুকে শিষ্যেরা অবতার বলতে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণা কর্ত্তে পারে।

ঈদৃশ বন্দনা (যেমন কবিরা বাল্মীকির বন্দনা করেন) সঙ্গতই মনে করা যাইতে পারে।

* ফলতঃ আজকাল লোকে যেমন ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিয়া স্বয়ংই পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া আরোগ্যলাভ করিতে চান—এ সকল উদ্ভট অবতারবাদীরাও 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ * * * তেন গচ্ছন ন রিষ্যতে' সেই শাস্ত্রসম্মত সাধন ভজনের পথ ছাড়িয়া অনায়াসে ভবব্যাধির প্রতীকারার্থ ঈদৃশ সহজ মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। তবে প্যাটেন্ট 'ফলেন পরিচীয়তে'—ফলাফল স্পষ্ট দেখা যায়, এদের ফলাফল ত্রিশঙ্কুত্বই মাত্র বেদিতব্য।

কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার হবে, এ কি রকম? ভগবানের অবতার যখন তখন যেখানে সেখানে হয় না।") * (স্বামী বিবেকানন্দ—৪র্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠা)

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ সকল কথায় প্রতিও একটু প্রণিধান করিবেন কি? কেবল ঢাকায় কেন, পূর্ব্ববঙ্গের আরো দু এক জেলার খবর জানি—যাতে এইরূপ উদ্ভট অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। এক খানি পুস্তকের নামও উল্লেখ করিয়া দিলাম, "ঠাকুর দয়ানন্দ"—৺ মহেন্দ্র নাথ দে এম, এ. বি, এস্-সি প্রণীত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেন তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করেন এবং এই 'ঠাকুর'টির একটু তথ্যানুসন্ধানও করেন।

আমি আক্ষেপ প্রকাশার্থই লিখিয়াছিলাম যে, রামকৃষ্ণ "পরমহংসও এসকল উদ্ভট অবতারের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরমহংস দেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে—একথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধেও বলিয়াছি; † কিন্তু "অবতার" বলিয়া তাঁহাকে মানিতে পারিব না; বরং অবতার সাজাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হইয়াছে—একথা ভূয়োভূয়ঃ বলিব। অবতার প্রতিপাদনার্থ "কথামৃত" 'লীলা প্রসঙ্গ' প্রভৃতিতে কত যে অত্যুক্তি ইত্যাদি রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ‡

* যাঁরা রামকৃষ্ণ দেবকে অবতার মনে করেন তাঁহাদেরও এসকল কথা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

† কেবল যে এখন বলিতেছি তাহা নহে। ১৩১৯ সালের কার্ত্তিকসংখ্যক "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রে "শঙ্করনাথ" শিরোনামে একটি গল্প প্রকাশিত করিয়াছিলাম—তাহাতে পরমহংসদেবের উল্লেখ সভক্তিক করা হইয়াছে। [তাহাতে চাপরাশের কথাটাও আছে, কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়ের সম্পর্কে নহে।]

‡ ইতঃপূর্ব্বে 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ ৺রামকৃষ্ণদেব ঈদৃশ অত্যুক্তিবাদিগণ কর্ত্তৃক কিরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, তাহার দু' একটী উদাহরণ দেখাইয়াছি। সুতরাং বাহুল্যেন।

—বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এ সকল অন্তররঞ্জন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

অন্যান্য প্রতিবাদকারীদিগের কটুক্তিভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধের উত্তরে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই; তবে ইহাদের বিচারশক্তি ও তথ্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। বাবু সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার লিখিয়াছেন, (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮—১৫৫ পৃঃ) "পত্র খানির [অর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের লিখিত পরমহংস দেব সম্বন্ধীয় প্রথম পত্রের] তারিখ দৃষ্টে বুঝা গেল, ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা"। সত্যেন্দ্র বাবু ঐ পত্রখানির তারিখ দেখিয়াছেন "২৭।৯।২৫"—ভাবিয়াছেন "২৭শে পৌষ ১৩২৫"; কিন্তু ঐ তারিখের পাশে একটি 'দ' চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লেখা হইয়াছে, "অর্থাৎ ২৫ পৌষ ১৩২৭—পূর্ব্বে সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতন রীতি", ইত্যাদি [প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয়ের 'তলাইয়া দেখার' অভ্যাসটা থাকিলে ঐরূপ ভ্রম ঘটিত না। এই 'দুই বৎসর পূর্ব্বের লেখা' বলিয়া তিনি যে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

বিগত (১৩২৮) শ্রাবণের 'সাহিত্যে' "মিথ্যা অভিযোগ" শীর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কিন্তু আমরা জানি রামকৃষ্ণ দেব আপনাকে অবতার বলিয়া মনেই করিতেন না। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবানের কি cancer হয়?" কথাটা ঠিক; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও নাকি এরূপ কথাই পরমহংসদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠে আছে— * * * "পরমহংস দেবের শেষ মুহূর্ত্তে * * তিনি [অর্থাৎ বিবেকানন্দ] তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি

বলতে পারেন, 'আমি ভগবান্' তবেই বিশ্বাস করি।" কি আশ্চর্য্য সেই মুহূর্ত্তে নিদারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যে পরমহংসদেব তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হোলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।"

যে বিবেকানন্দ এরূপ কথা (প্রতিবাদকারিণীর * মতে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা) প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও উচ্চ ধারণা হইতে পারে কি? আমরা যদি পাকেপ্রকারে 'প্রবঞ্চক' ঠাওরাইয়া থাকি, তবে কি আমাদের খুব গুরুতর অপরাধ হইবে? এইরূপ ব্যক্তির বাণী কি 'বীরবাণী' হইবার উপযুক্ত? ঈদৃশ লোকই কি সন্ন্যাসের বা ধর্ম্মপ্রচারের অধিকারী?

এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, 'কথামৃত', 'লীলা প্রসঙ্গ' ইত্যাদিতেও রামকৃষ্ণ যে নিজকে অবতার মনে করিতেন, এরূপ কথা পাওয়া যায়। তবে কি এ সকলের লেখকগণও (এই প্রতিবাদ-লেখিকার মতেও) অসত্যের প্রচারক? অপরের লেখাকে "মিথ্যা অভিযোগ" বলিয়া অভিহিত করিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় তৎসম্প্রদায়ের লিখিত কাহিনী ভাল করিয়া পড়াটা কি উচিত ছিল না?

ঐ শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" অপর একজনের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি উপসংহারে এই অধমকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন 'তবে হঠাৎ নাম করিতে হ'লে ঢক্কী কি বাঘ ঠেঙ্গান দরকার, নচেৎ নাম ফাটিবে না।' পরেই নিজের পরিচয় এ ভাবে লিখিয়াছেন,—

"শ্রী * * * * কবিশেখর কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি, * * * * ষ্ট্রীট" †

* ইনি নিজেকে 'বেথুন কলেজের ছাত্রী', বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধের ভাষা ইত্যাদিতে স্ত্রীজনসুলভ শালীনতার অথবা উচ্চ-শিক্ষাজনিত বিনয়ের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। [প্রবন্ধ ছদ্মনামেও লেখা হইতে পারে।]

† নাম ও ঠিকানা নানাকারণে এস্থলে প্রকাশ করা হইল না।

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। * ইহাতে যিশুখৃষ্টের বাণীই মনে পড়ে—'The mote thou seest in the eyes of others, but not the beam in thine own."

ইনি বলিয়াছেন "লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ জাতিস্মর ছিলেন"। আমার লেখা যিনিই অভিনিবেশ সহকারে পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, যে 'বিবেকানন্দ জাতিস্মর ছিলেন' একথা আমার স্বীকার উক্তি নহে; একথা তাঁহার জীবন-চরিতে (স্বামী বিবেকানন্দ—১৫০ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরমহংস বলিতেন, "ও (বিবেকানন্দ) যখন জানতে পারবে ও কে, তখনই দেহত্যাগ করবে।" অথচ মৃত্যুর ৫ বৎসর পূর্ব্বেই দেখা যায় বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা, অর্থাৎ তিনি কে, ইহা জানিতেন—অথচ তখনই দেহত্যাগ করেন নাই। দুই কথার অসঙ্গতি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল,—এই স্পষ্ট কথাটাও প্রতিবাদলেখকের বোধগম্য হয় নাই!

অন্য একজন প্রতিবাদকারী এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকিতে কেন এ সকল কথা প্রকাশ করি নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কেন তাঁহার কথার ও কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছি। এই অভিযোগ অতি অকিঞ্চিৎকর; তথাপি ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাত্র বৎসরেকের পরেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। অতএব ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও তাঁহার জীবিত সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশই

* পরন্ত পরিচয়ের ঘটা দেখিয়া মনে হয় কবিরাজ মহাশয় শিখণ্ডী হইয়া দণ্ডায়মান—পশ্চাতে কোনও ধনঞ্জয় অবস্থিত হইয়া কটূক্তির বাণ বর্ষণ করিতেছেন।

ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার দু'চারিটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ভিন্ন (আমেরিকার প্রথম এক দুইটি বক্তৃতা ছাড়া) আমি তাঁহার বিশেষ কোনও কিছু তখন পর্যান্ত পড়ি নাই—তাঁহার কোন জীবনচরিতও তখন দেখি নাই। এই সে দিন মাত্র তাঁহার পত্রাবলী (১ম খণ্ড) 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি দু' একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি—এবং যে জীবন-চরিত-খানি হইতে আমার প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা প্রবন্ধলেখার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে মাত্র হস্তগত হইয়াছে। তবে যখনই সুবিধা পাইয়াছি, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছি; ১৩১৬ সালে (স্বামীজির মৃত্যুর মাত্র ৭বৎসর পরে) যখন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করি, তখনই রায় মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বিবেকানন্দের কথার উত্তরে স্বামীজির সম্বন্ধে দু' একটা স্পষ্ট কথা লিখিয়াছিলাম।* ঐ সকল কথা পড়িয়া স্বামীজির জনৈক ভক্ত (১৩২৩ সালে) আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চিঠি লিখিয়াছিলেন; তদুত্তরে তাঁহার প্রবোধার্থে গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সহিত আমার যে সব কথা হয় এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা জন্মে, এ সকল সংক্ষিপ্তভাবে যথাস্থ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম †—ইহা হইতেই "আসামে বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। অতএব 'কুড়ি বছর পরে' যে এই প্রথম এরূপ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিলাম, ইহা ঠিক নহে। তারপর, বিবেকানন্দ পরলোক

* "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস" (গৌহাটী সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত) ১৬ পৃঃ হইতে ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ঐ ভক্তটি আমার একজন আত্মীয়বন্ধু—শিলং থাকিতেন। সেই স্থানের আরো অনেকে আমার সেই যুক্তিমূলক লেখা পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ইহার উপর আর তর্ক চলে নাই। লেখাটা ফেরত পাইয়াছিলাম।

প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—তাঁহার কীর্ত্তি, তদীয় গ্রন্থাবলী, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাই বলিয়াছি, এরূপ অভিযোগ অকিঞ্চিৎকর।

এক্ষণে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্প্রদায়-ভুক্ত যে সকল বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কীয় যে সকল গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যাবলী সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে, এগুলির ভিতরে পরস্পরবিরোধী বহু অসমঞ্জস কথা রহিয়াছে—আমি দিঙ্ মাত্র প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ অসামঞ্জস্য থাকা সম্প্রদায়ের গৌরবজনক নহে। তাঁহারা ঠিক কি ছিলেন, এরূপ অসঙ্গত উক্তিগুলি পাঠ করিয়া বুঝা যায় না। অপিচ অতিরঞ্জন দ্বারা এবং অপরকে অকৃপ্ত করিয়া * উঁহাদিগকে বাড়াইবার যে একটা প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে অশোভন। বিশেষতঃ সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী কথা থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবেই এবং তাহা হইলে এ সকলের তীব্র প্রতিবাদও অবশ্যই হইবে। আবার পরমহংস দেবের বা বিবেকানন্দের নিষ্ঠুরতোদ্দীর্ণবাক্যাদি † সবই যে প্রকাশ করিতে

* এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কতক বলিয়াছি—এ স্থলে এতৎসমর্থক কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইল। রামকৃষ্ণের গুরু পরমহংস তোতাপুরী এবং উত্তরসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী কি ভাবে (রামকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রদর্শনচ্ছলে) বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা "লীলাপ্রসঙ্গ" গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

† উদাহরণ :—শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে খুব কীর্ত্তন হইয়াছে, অনেকেই তাতে নাচিয়াছেন; কীর্ত্তনান্তে রামকৃষ্ণ "সহাস্যে বলছেন 'হাজরা' নেচেছিল। নরেন্দ্র (সহাস্যে) আজ্ঞা, একটু একটু। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) একটু একটু? নরেন্দ্র (সহাস্যে) ভুঁড়ি আর একটি জিনিষ নেচেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সে আপনি দোলে—না দোলাতে—আপনি দোলে (সকলের হাস্য)।" কথামৃত—পূর্ব্ব ভাগ, ৯ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ। কীর্ত্তনের সময় গুরু শিষ্যের দৃষ্টিটা কোন্ দিকে ছিল, দেখুন—অশ্লীলতার কথা না-ই বলিলাম। হাজরার

হইবে, এমনও নহে ; বরং জুগুপ্সিত বিষয়ের অনুল্লেখই বাঞ্ছনীয়, নচেৎ লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবার কথা। আশা করি তাঁহারা এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন—এবং এই অধম এ সকল অনেকটা ঘাটিয়া দেখাইয়াছে বলিয়া যেন রুষ্ট না হন। রামকৃষ্ণদেবকে আমি বাল্যাবধি শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি—তাই তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে কথা বলিয়াছি ; পরন্তু তাঁহার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তাদৃশ সমালোচক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরমহংস দেবকেও বিড়ম্বিত হইতে হইবে। *

পরিশেষে এতদুপলক্ষে "সাহিত্যে"র মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যে সকল 'বৈঠকী' আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দু একটি কথার প্রতিবাদ না করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি আমাদের সম্মানার্হ ; কিন্তু "দোষা বাচ্যা গুরোরপি"। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বাধিত। কিন্তু আমার বোধ হয় সম্পাদকীয় ভাবে তিনি এ সকল প্রবন্ধের আলোচনা না করিলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক, তিনি [সাহিত্য ১৩২৮] "বৈশাখে"র 'বৈঠকীতে' আমার প্রবন্ধাবলীকে 'সুললিত সন্দর্ভগুলি' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—এবং এগুলির উপলক্ষে তাঁহার উপর রোষ ও অভিমান প্রকটনপূর্ব্বক অনেকে যে চিঠি পত্র লিখিতেছিলেন, তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশও করিয়াছিলেন। বলা আবশ্যক যে, সেই মাসেই "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়—এবং তৎপূর্ব্বেই প্রবন্ধের সমগ্রটা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

অপরাধ, তিনি পরমহংস দেবের সমক্ষেই তৎসম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে অপ্রিয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন।

* ইতোমধ্যেই কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ লিখিত "সহজিয়া ধর্ম্মমত" প্রবন্ধ (ব্রাহ্মণ সমাজ, ভাদ্র ১৩২৮) দ্রষ্টব্য।

"জ্যৈষ্ঠ" সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য কিছুই ছিল না, তবে এই সংখ্যায়ই প্রথম প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়—তাহাতে এ দীনের উপর নিছক গালি বর্ষণ হয়—সম্পাদক মহাশয় তাহা যথাযথ পত্রস্থ করিয়াছেন—তবে অভদ্রোক্তিগুলি বাদ দিলেও প্রতিবাদ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইত না। *

তারপর "আষাঢ়" সংখ্যায় 'বৈঠকী'তে লিখিলেন, "বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তেমন নির্ম্মৎসর ভাবে লেখনী চালাইতে পারিতেছেন না—তাঁহার লেখায় একটু যেন রীষের বিষ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।" অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'সাহিত্যে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেও সমগ্র প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বৈশাখের 'বৈঠকী'তে প্রশংসাবাদের পূর্ব্বেই পাঠান হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই আষাঢ়ী বৈঠকীয় তৈল নিক্ষেপেও প্রতিবাদের তরঙ্গ থামে নাই; 'বেঙ্গলী' ও 'সার্ভেন্ট' পত্রে একজন পত্রপ্রেরক প্রবন্ধলেখক সহ সম্পাদক মহাশয়কেও গালি দিয়া 'সাহিত্য' বয়কটের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। †

অতঃপর "শ্রাবণে"র 'বৈঠকী'তে সম্পাদক মহাশয় হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বহু কথার অবতারণাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবটা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি একথা বলিতে পারি না; তবে বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি নিম্নোক্ত প্রকারে শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে; (১) বাঙ্গালী গুরুপুরোহিতের অভাবে দলে দলে গুরুপুরোহিতভূমিষ্ঠ

* প্রতিবাদী যে প্রবন্ধের সমালোচনায় এত কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার নিজের কথা সামান্যই ছিল, এবং তাহা পরমহংসদেবসম্বন্ধীয় বলিয়া যথোচিত সংযতই ছিল। কিন্তু প্রতিবাদকারীর দৃষ্টি ছিল বোধ হয় বিবেকানন্দ-বিষয়ক পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যাহা ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও প্রতিবাদীর প্রকৃতির পরিচয় আরো একটু পাওয়া যাইতেছে।

† এই ভয় প্রদর্শনের কিয়ৎকাল পরেই "সাহিত্য" পত্রখানি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা বিবেকানন্দী দলের কাজ বলিয়াই একজন প্রতিবাদকারীর প্রবন্ধ (ব্রাহ্মণসমাজ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) হইতে অনুমিত হয়। অনুমান সত্য হইলে, ইহাদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি কত বেগবতী ইহাই সূচিত হয়।

মোসলমান সমাজে ঢুকিতে আরম্ভ করিল, শেষে খৃষ্টানও হইতে লাগিল, তাই পূর্ব্বঙ্গর বাঙ্গালায় ২৪ কোটি মোসলমান ও ৩০ লক্ষ খৃষ্টান; (২) আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় হিন্দুর ধর্ম্মের কর্ম্মের এবং সমাজের কোনও চিহ্নই থাকিবে না; (৩) রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এই ভাঙ্গনের মুখে বালির বস্তা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন; (৪) ইহাদের কর্ম্মের পরিমাপ কপুনন্দনী পক্ষে হইবে না; (৫) স্বামী বিবেকানন্দও নাকি বলিয়াছেন "চাই, বেদান্তের প্রচার দ্বারা 'আমি'কে জাতি-বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রকট করা।"

এ সকল দফার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। সংক্ষেপতঃ প্রথম দফার উত্তরে এই বলা যায় যে, ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই সাধারণ লোক—নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত—ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ পাইয়াছে—মোসলমান হইবার প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। শতাধিক বর্ষব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টায়ও খৃষ্টান পাদরীরা এদেশে কিছুই করিতে পারিলেন না—খাসিয়া গারো সাঁওতাল ইত্যাদির মধ্যেই যা কিছু সামান্য প্রচার করিতে ইহারা সমর্থ হইয়াছেন। মোসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রধানতঃ বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহেরই ফল—এরূপ বৃদ্ধি দারিদ্র্য ও তজ্জনিত চৌর্য্যাদি অপরাধের উৎপাদক—জেলখানার দিকে তাকাইলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। খৃষ্টানও নূতন করে বড় কেহ হইতেছে না। দ্বিতীয় দফার উত্তর ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা না হইলে কিরূপে দেওয়া যায়? তবে যে সনাতন সমাজ বহু বিপ্লবের ভিতর দিয়া আসিয়া আজও টিকিয়া রহিয়াছে এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাহার স্রষ্টা (চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্) এবং রক্ষক (ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে) বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বলা বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে অতিশয় সাহসের কাজই হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তন সমাজে কালক্রমে হইবেই—সেই

পরিবর্ত্তনটা যাহাতে স্বরান্বিত হয়, স্বাজাত্যপ্রেমী মাত্রেরই সেই চেষ্টা হওয়া উচিত—এবং এই চেষ্টা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণাদি দ্বারাই হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় দফার উত্তরে বক্তব্য যে, আজ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় হিন্দুসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই—অতএব এযাবৎ "খালির বস্তা"র পরিচিহ্ন কোনও কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। চতুর্থ দফার উত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই—কেন না বিবেকানন্দের চেষ্টা যে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাশাসিত সমাজ বিধির প্রতিকূল, তাহা আমি ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছি। বলা আবশ্যক রঘুনন্দন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রেরই প্রচারক—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরিভক্তি বিলাসেও শাস্ত্রাদি অবলম্বনপূর্ব্বক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাতে সনাতন ধর্ম্মের ধারা অবিচ্ছন্ন রাখিবারই প্রয়াস আছে। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের হরিভক্তি-বিলাসকারের ন্যায় বিদ্বানের অত্যন্তাভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পণ্ডিত ও অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন—তিনি শাস্ত্রানুমোদিত যাহা স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন—তাহার অনুসরণেই 'হরিভক্তিবিলাস' সঙ্কলিত হইয়াছে; রামকৃষ্ণ শাস্ত্র জানিতেন না—যদিও গুরূপদেশ ও সাধুসঙ্গে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট কেহ 'হরিভক্তি বিলাসের' ন্যায় গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হন নাই। তাঁহার যে সকল উক্তি সোজা কথায় আছে, তাহাই 'টেনে বুনে' রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে শাস্ত্র বিচার নাই। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সংস্কারকগণও যথাসম্ভব শাস্ত্রের উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিয়া স্বীয় মত চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন —রামকৃষ্ণসম্প্রদায় তেমনটা করেন নাই, করিবার শক্তিসামর্থ্যও ইঁহাদের নাই।* পঞ্চম দফা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে 'বেদান্তের প্রচার', যে দেশে

* ফলতঃ যাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণের জীবন চরিত্র বা ধর্ম্মমত

করিবার অধিকার স্বামী বিবেকানন্দের ছিল, তথায় অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাহিরে বরং কিছুটা ফল হইয়াছিল—এদেশে তাঁহার কাছ হইতে বেদান্তের বাণী কেহ শুনিবে না, শুনেও নাই। এ দেশের লোক তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর (বেদান্তে) ব্যুৎপন্ন রামমোহন রায়ের কথাই শুনে নাই। এমন কি রামমোহনের অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মেরাই 'Vedantism discarded' করিয়া যাদৃচ্ছিক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ লালা হংসরাজকে বলিয়াছিলেন, "আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের গোঁড়ামি (ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলিয়া তাঁর আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) দ্বারা আরো অদ্ভুতরূপে ও অতিশীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার জানা আছে।" ইত্যাদি (ভারতে বিবেকানন্দ ৩৭১ পৃষ্ঠা)। তিনি অবশেষে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজার বিধানব্যবস্থা যে তিনিই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এখন সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন এই যে, বিবেকানন্দ তো প্রায় কুড়ি বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছেন—এবং রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ও আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ ('মিশন' প্রতিষ্ঠার কাল হইতে) কাজ করিতেছেন। কোথায় কোন্ পতিত জাতির উদ্ধার সাধন তাঁহারা করিয়াছেন এবং মোসলমান ও খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি বিবৃত করিয়া দেখাইবেন? হাসপাতালের সংখ্যা দু একটা বাড়াইয়াছেন, সন্দেহ নাই—এবং দুর্ভিক্ষাদিতে গিয়া সেবার ব্যবস্থা করেন, ইহাও প্রশংসার বিষয়। পরন্তু

অচ্ছিদ্রভাবে প্রচার করিতে পারেন নাই, এমন কি তাঁহাদের 'চিত্রে'ও যে মধ্যে মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তাঁহারা 'হরিভক্তি বিলাসের' ন্যায় রঘুনন্দনের স্মৃতির অনুকল্প কিছু দাঁড় করাইতে পারিবেন, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

এই যে বৈষ্ণব গোস্বামীরা অনার্য্য জাতীয়দিগকে ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারা সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন কি? মনে রাখিবেন যে, মিশনারিগণ ঐ সকল স্থলেই দুর্ভিক্ষাদিতে সহায়তা করিয়া লোকদের খ্রীষ্টান বানাইয়া খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। তারপর একটা মোটা কথা এই যে, যদি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করাইয়া মোসলমান বা খৃষ্টান হওয়ার তরঙ্গ রোধ করিতেই হয়—তাহা কি আমাদের বাঞ্ছনীয়? বর্ণাশ্রমবিরোধী সম্প্রদায়ে এবং খৃষ্টানে বা মোসলমানে আমাদের নিকট পরমার্থতঃ পার্থক্য কি? ফলতঃ ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া হিতসাধন কিরূপে সম্ভাবিত? *

তারপর সম্পাদক মহাশয় আমার প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ পক্ষে সমর্থন করিলেন না।" তাঁহারা বৃথা এ বিষয়ে যোগ দিতে কেন আসিবেন? তাঁহারা তো (সম্পাদক মহাশয়েরই ন্যায়) দেখিতেছেন "কোন প্রতিবাদী আগাগোড়া সবটা পড়িয়া ঠিকমত উত্তর দিল না।" তবে তাঁহারা কেন আসরে নামিবেন? পরন্তু এ দীন লেখককে দু'একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাচনিক এবং চিঠি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, একথা সম্পাদক মহাশয়ের অবগত্যর্থে নিবেদন করিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত 'ব্রাহ্মণ সমাজের' গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। † একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এই প্রবন্ধগুলি

* হিন্দু সমাজ ভঙ্গের তরঙ্গ রোধিতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় বালির বস্তা ফেলিতে কৃতকার্য্য হউন—আর না-ই হউন সম্পাদক মহাশয়ের ঐ সম্প্রদায় তথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এরূপ লেখা যে প্রতিবাদের গালির তরঙ্গে বালির বস্তার কাজ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না ঐ সংখ্যায় মদীয় 'বিবেকানন্দ' প্রবন্ধের শেষাংশ প্রকাশিত হইলেও, অতঃপর আর কোনও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

† বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার প্রবন্ধাবলীর কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু

পড়িয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এস্থলে উল্লেখ করা উচিত মনে করিতেছি :—"আমরা তো এত কথা জানিতাম না ; তাই বিবেকানন্দ সোসাইটিতেও যোগ দিতাম ; তবে একবার ঐ সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়া অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে কিছু বলাতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যেন উহার কর্তৃপক্ষীয়েরা আমার কথা সমর্থন করেন না ; সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটির সম্পর্ক এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি।" এ ছাড়া বঙ্গের অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক (যিনি ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু খুব "গোঁড়া হিন্দু" নহেন) লিখিয়াছেন "* * * যে যুগ আসিয়াছে, সে নবীন যুগ—পুরাতনের সহিত অনুবন্ধহীন অভূতপূর্ব্ব অভিনব যুগ। ইহার শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণা সমস্তই অভিনব—বহুবিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল। তাহার মধ্যে শৃঙ্খলার অধিকার কামনা এবং সেই কামনা পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা নিরর্থক। * * * তথাপি ব্রাহ্মণের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "নেদং যদিদমুপাসতে" বলা ব্রাহ্মণের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে (সে কালেও সেরূপ উক্তির প্রয়োজন ছিল, এ কালেও সে প্রয়োজন একেবারে উড়িয়া যায় নাই)। সেই হিসাবে আমি আপনার আলোচনা নিবিষ্টমনে পাঠ করিয়া থাকি—তাহাতে ভাব পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। * * *" (পত্রের শেষার্দ্ধ হইতে উদ্ধৃত)।

উপসংহারে বক্তব্য যে দুর্ভাগ্যবশতঃ সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও সমাজের পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতি পক্ষের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার লোক দিন দিনই বিরল হইয়া পড়িতেছেন—অযোগ্য হইলেও এ সময় স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে পিতৃ পিতামহের ধর্ম্ম ও সমাজের অনুকূলে, বিশেষতঃ বিপক্ষের প্রতিকূলে, দুচারি কথা না বলিয়া উদাসীন থাকা কাপুরুষতা মনে করি। ইহাতে যদি প্রতিপক্ষের কটূক্তির আঘাত সহ্য করিতে হয়, তাহাতে প্রস্তুত আছি ; কেবল বলিব, ভাই, Strike but hear—মারো কিন্তু শুন।

তাহা তদীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। একদিন পূর্ব্বে পাইলে তাঁহার প্রবন্ধের হয়তো কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইত।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ক। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়।

"সাহিত্য" পত্রে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মদীয় প্রবন্ধাবলী * প্রকাশিত হইবার পরে "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ মহোদয় ঐ বিষয়ে 'ব্রাহ্মণসমাজে'ও কিছু লিখিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহার সেই অনুরোধ বশতঃ লিখিত হইল। বলা বাহুল্য যে ইহা "সাহিত্যে" প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর কেবল পুনরাবৃত্তি বা সারসংক্ষেপ মাত্র নহে; ইহাকে ঐ গুলির "পরিশিষ্ট" বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। †

পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নাম রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনচরিত, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি পরমহংসদেবের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয় একজন শাস্ত্রদর্শী ধর্ম্মবক্তা ও সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তি; অথচ পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধানুরাগও যথেষ্ট ছিল—নচেৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেই বা তিনি যাইতেন কেন?

---

* "সাহিত্য" ১৩২৭ সাল পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র" ১৩২৮ সাল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, পৌষ ও মাঘ; এই সংখ্যাগুলি (অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং প্রথম পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।

† ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ গুলির যে সকল কথার পুনরুল্লেখ হইয়াছে—সে সব বাদ দিতে পারিলে ভাল হইত; কিন্তু পরবর্ত্তী দুইটি প্রবন্ধ (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট খ ও গ) এই প্রবন্ধেরই প্রতিবাদের সমালোচনা হওয়াতে, ইহার অঙ্গহানি করা হইল না—কেননা তাহা হইলে ঐ দুই প্রবন্ধ অনায়াসে বোধগম্য হইত না। আশা করি সুধী পাঠকগণ এই পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

পরমহংসদেবের প্রতি আমারও ছাত্রাবস্থা হইতেই ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে; "ব্রাহ্মণ সমাজে" ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "শঙ্কর নাথ" প্রবন্ধ হইতে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

চূড়ামণি মহাশয় আজ ৪ চারি বৎসর হইল গৌহাটীতে আসিলে, তিনি ৺ পরমহংসদেবকে দেখিয়াছেন—তাঁহার নিকট হইতে পরমহংসের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিব, এই মনে করিয়াই তদ্বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—তন্মধ্যে একটী এই ছিল যে পরমহংস তাঁহাকে "চাপরাশ" আছে কি না, * ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না। চূড়ামণি মহাশয় চাপরাশের কথা একেবারেই অস্বীকার করেন। অথচ ৺পরমহংসের জীবনচরিত লেখক ৺রামচন্দ্র দত্ত, কথামৃতকার শ্রীম, এবং লীলাপ্রসঙ্গ লেখক স্বামী সারদানন্দ সকলেই ঐ 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথা হইয়াছিল, বলিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয়ের ঐ কথা "সাহিত্য" পত্রে (১৩২১ পৌষ মাঘ সংখ্যায়) প্রকাশিত হইলে তৎপ্রতিবাদচ্ছলে একজন লিখিয়াছিলেন যে 'চাপরাশের' কথা যিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু প্রতিবাদকারীর এটা একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র, নচেৎ এই সাক্ষীটির নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিয়া তথ্যানুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন †—আমরাও দেখিতাম চূড়ামণি মহাশয়ের কথা বিশ্বসনীয় কি উঁহাদেরই কথা প্রত্যয়যোগ্য। এদিকে যেদিবসের সাক্ষাৎকার সময়ে পরমহংস একথা চূড়ামণি মহাশয়কে

* রামচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন—চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "হ্যাঁ গা তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, তোমার "চাপরাশ" আছে ?" রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী ৪৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† প্রতিবাদীর উত্তরে "সাহিত্যে" ১৩২৮—মাঘ সংখ্যায় [প্রথম পরিশিষ্ট ক] এতাদৃশ মন্তব্য করা হইলেও অদ্যাপি তিনি তাঁহার সাক্ষীর নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই।

বলিয়াছিলেন বলিয়া ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ দিনকার সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেদব্যাস' পত্রের ২য় খণ্ড (১২৯৪ অব্দ) ১০ম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—তাহাতে 'চাপরাশে'র নামগন্ধও নাই,—অথচ ঐ সাক্ষাৎকার ভূধর বাবুর বাড়ীতে হইয়াছিল এবং তিনি ঐ স্থানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনকার বিবরণী লেখকদের মধ্যে ভূধর বাবুই আদি এবং অকৃত্রিম বলিয়া আমার বিশ্বাস। ফলতঃ একজনের বাড়ী গিয়া (চূড়ামণি মহাশয় তখন ভূধর বাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন) তাঁহাকে "চাপরাশ" আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাটা অস্বাভাবিক ও অতি অভদ্রতা; ৺পরমহংস তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না। তবে তদীয় জীবনচরিতকার ও 'কথামৃত' 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি চরিতকৃগণের ৺পরমহংসদেবকে বাড়াইবার জন্য অন্যকে খর্ব্বীকৃত করাটা এই নূতন নহে—ইহা তাঁহাদের অভ্যস্ত কার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর একখানি জীবনচরিতে আছে—"... ... পরমহংসদেবের জীবনী লেখকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহিত গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া অযথা কল্পনা ও অশোভন উক্তির প্রশ্রয় দান করিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে গোস্বামীপ্রভু পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন—'আমার ও পরমহংসদেবের মধ্যে সময়ে সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক যে সকল গূঢ় কথোপকথন হইত; তাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই অধিকার ছিল না। তাঁহারা (জীবনীলেখকেরা) তাহা কি প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইবেন?' ['গোস্বামীপ্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।']" *

"লীলাপ্রসঙ্গ"কার তো উদ্দাম কল্পনাবলে লিখিয়াছেন যে চূড়ামণি

* শ্রীসদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত প্রণীত—তৃতীয় সংস্করণ ২১৯ পৃষ্ঠা।

মহাশয় ঐ 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথা শুনিবার কিছুকাল পরেই প্রচার কার্য্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যাপীঠে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন [লীলা-প্রসঙ্গ গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ২২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য] অথচ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন যে পরমহংসের সঙ্গে দেখা করিবার ৩।৪ বৎসর পরে তিনি শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে ধর্ম্মবক্তৃতা করিয়া কামরূপ অঞ্চলেও প্রচারার্থ গমন করেন এবং তৎ সময়েই ৺কামাখ্যাধামে গিয়া (অন্য দশজনের ন্যায়) তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তার পরেও তিনি নানা স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন—আমি ১২৯৮ কি ৯৯ বাঙ্গালায় (ঢাকাতে) তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম।

এ ছাড়া চূড়ামণি মহাশয় হইতে পরমহংসদেব সম্বন্ধে আর যে সব কথা জানিতে পারিয়াছিলাম, সংক্ষেপে * তাহারও আলোচনা করিতেছি।

(১) "পরমহংসের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ তিনি ৺রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে দেখিতে পান নাই। তবে তাঁহাকে "অবধূত" সংজ্ঞাভাজন করা যাইতে পারিত। চূড়ামণি মহাশয়ের এই মত অপর এক অতি বড় পণ্ডিত কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। ৺রামচন্দ্র দত্ত কৃত পরমহংসদেবের জীবন-চরিতে আছে—কোন্নগর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহোদয় পরমহংসদেবকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর লক্ষণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি আমার নমস্য?"

(২) পরমহংসদেবের যে সমাধির ভাব হইত তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হইত না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থা বিশেষের ফল। পরমহংসের মস্তিষ্কের অবস্থা অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল; প্রকৃতি অত্যন্ত

* বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ ও প্রথম পরিশিষ্ট—'ক' (রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি শীর্ষক) প্রবন্ধ হইতে দেখিবেন।

কোমল ছিল। সেই কারণেই গান শ্রবণাদি কালে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাইত। অবস্থায় যে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিতেন সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল; সমাধিশাস্ত্রে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই অনুমানও তাঁহার জীবন চরিতে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয়। যখন সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন নাই, সেই সময়েই (অর্থাৎ বাল্যকালে) "ঠাকুরদেবতার প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতেন ও সময়ে সময়ে তিনি তদ্ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন।" (৺রামচন্দ্র দত্ত কৃত জীবনচরিত)।*

(৩) পরমহংস দেবের দেহাবসানের কিছু পূর্ব্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন; তর্কচূড়ামণি মহাশয় ইহা বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে একথা স্পষ্টই বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—পরমহংসদেবও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন—এবং কুসংসর্গের আবর্ত্তে পড়িয়াই যে তাঁহার এরূপ অবনতির কারণ ঘটিয়াছে তাহাও অঙ্গীকার পূর্ব্বক তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐ সংসর্গ ত্যাগের চেষ্টা করিলেও উহারা তাঁহাকে ছাড়ে না। পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "এখন এ বন্ধন কাটানের আর কোন উপায় নাই। কাজেই এবার এই ভাবেই যাইবে।" ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার গলরোগ তৎপরে দেহাবসান হয়। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই কথারও পরিপোষক কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ৺রামচন্দ্র দত্ত কৃত জীবনচরিতে আছে—"তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।" (জীবনচরিত তৃতীয় সংস্করণ ১৫৪ পৃষ্ঠা)

* ইংরেজীতে যাহাকে নার্ভাস্ (Nervous) বলে পরমহংস দেব তাহাই ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্মুখে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না। লীলা-প্রসঙ্গে আছে, একবার কেশবচন্দ্র সেন কোনও পাদরীসাহেবসহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন, সংবাদ পাইয়া তিনি বারংবার ঝাউতলায় (অর্থাৎ বাহ্য করিতে) গিয়াছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ ২৪০—৪১ পৃষ্ঠা।

এই কুসংসর্গবশতঃ নামিয়া পড়ার বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তাঁহার ভক্তেরা অবতার মনে করেন—আমরা অবশ্য তাহা করি না। কিন্তু অবতার হউন আর না হউন—তিনি যে একজন সাধুব্যক্তি ছিলেন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। পূর্ব্ব জন্মের অশেষ সুকৃতিবশতঃ বাল্যাবধি তাঁহার প্রাণের টান শ্রীভগবানের প্রতি পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয় কোমল হওয়াতে তিনি সহজেই ঐগুলি ভগবদভিমুখ করিতে পারিয়াছিলেন—ভক্তের হৃদয় কোমল না হইলে তাহাতে ভগবদধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভবে? যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের জন্য তিনি ব্যাকুলচিত্তে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন—ধ্রুবের মত একাগ্রতা সহকারে ভগবদ্দর্শনের জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল—তাই সদ্‌গুরুলাভ করিয়াছিলেন, উত্তম উত্তম সাধক পাইয়াছিলেন—সাধন-ভজনের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই চলিয়াছিলেন। জীবনের প্রৌঢ়াবস্থায় ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়—কেশববাবুরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে সাধারণ্যে পরিচিত করিয়াছিলেন। পরন্তু প্রায় তখন হইতেই কু-সংসর্গও আরম্ভ হইল। এখানে 'কু' অর্থে চরিত্রহীন লোক যেন কেহ না বুঝেন। বরং ইহারা অনেকেই সরল ও সচ্চরিত্র এবং সুশিক্ষিতও ছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্য রীতিতে হওয়াতে ইহারা প্রায়শঃ সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্যক্ অপ্রবিষ্ট ছিলেন এবং জীবনে অপর কোনও খাঁটি সাধু সন্ন্যাসীও বোধ হয় দেখেন নাই। তাই পরমহংসদেবের অবস্থা দর্শনে এতাদৃশ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া খাড়াপিড় করিতে লাগিলেন। যাঁর বর্ণজ্ঞানও ছিল না বলিলেই হয়—যাঁর দারিদ্র্যহেতুক কৈবর্ত্তের ঠাকুরবাড়ীতে পূজকের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—তাঁহার নিকটে আসিয়া সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ বড়

ঘরের ছেলেরা সব স্তবস্তুতি করিতে লাগিল—ইহাতে তিনি যে সম্পূর্ণ বিগড়িয়া যান নাই—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা চোখের সামনে দেখতেছি—যাঁহারা পদে পদার্থ, ধনে মানে, শিক্ষা দীক্ষায়, সমাজের শিরোভূষণ এমন সব লোকও "তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু" বাদীদের খপ্পরে পড়িয়া সুনাম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অপার করুণার পাত্র—তাঁহার এই সাংসারিক অভিজ্ঞতাশূন্য সরল প্রকৃতির ছেলেটির পা পিছলিয়াছিল *—কিন্তু তিনি তাঁহাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেন নাই—তবে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক অবনতি ও দৈহিক যন্ত্রণা জোগাইয়া পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিলেন।

এই যে 'স্তবস্তুতি' বা 'অবতার' খ্যাপন—এতদ্বারা পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক অবনতির কতকটা লক্ষণ তাঁহার শেষ জীবনে—যৎসময়ের খবর আমরা 'কথামৃত' প্রভৃতি হইতে পাই—দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় 'সাধুর লক্ষণ কি?' এ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন :—

"সাধু যিনি তিনি আত্মপ্রশংসা করেন না, পরনিন্দা করেন না, আঘাত দিয়া কথা বলেন না, কাহাকেও নিজের মতে টানিতে চেষ্টা করেন না, কোনও প্রকার বুজরুকি দেখান না, সাধুরা মনগড়া কথা কাহাকেও

* লাওনাইজ্ (Lionize) করিয়া লোকে স্কটলণ্ডের স্বভাবকবি বার্ণস্ (Burns) এর অনিষ্ট করিয়াছিল—কারলাইল তদীয় "হিরো ওয়ার্শিপ" (Hero worship) গ্রন্থে লিখিয়াছেন And yet alas, as I have observed elsewhere, these Lion hunters were the ruin and death of Burns ... ... He could not get his Lionism forgotten, honestly as he was disposed to do. ... ... Richter says, in the island of Sumatra there is a kind of 'Lightchafers', large fireflies, which people

বলেন না, শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া কথা বলেন, এবং তিনি প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। সাধু সর্ব্বদা সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন" (৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন গুপ্ত প্রণীত—১৪৩ পৃষ্ঠা) পরমহংস দেবের মধ্যে এই লক্ষণগুলির কোনও কোনওটির ব্যত্যয় আমরা "কথামৃত" ইত্যাদিতে দেখিতে পাই। পরমহংস হাজরাকে উপদেশ দিবার সময় অবশ্যই বলিয়াছেন "কারো নিন্দা করো না—"* তথাপি হাজরা বেচারার নিন্দায় তিনি ও ভক্তগণ সকলেই পঞ্চমুখ ছিলেন। স্বয়ং কথামৃতকারও ছাড়েন নাই—হাজরার অপরোক্ষে বলিয়াছিলেন "হাজরা মহাশয় কেবল কড়র্ কড়র্ করে বকে, চুপ না করলে কিছু হবে না।" কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩০ পৃঃ।

হাজরা বরং অজ্ঞাত ব্যক্তি; আদি সমাজের আচার্য্য, ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ছাত্র, এমন কি যে শম্ভূমল্লিক একজন 'রসদদার' ছিলেন তিনিও নিন্দার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২১০ পৃঃ, ২৩৯ পৃঃ ২৪০ পৃঃ, যথাক্রমে দ্রষ্টব্য)। এও বরং মার্জ্জনীয়; লীলাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় গুরু তোতাপুরীর দোষোদঘাটনের কথাও আছে—এবং তাঁহাকে যে 'শালা' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন—এটাও উল্লেখিত আছে। (গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ অষ্টম অধ্যায় ২৬১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) গুরুকে খাটো করিয়া নিজের বড়াই দেখানো কতদূর অধোগতির পরিচায়ক

stick upon spits and illumine the ways with, at night. ... ... Great honour to the firefly! But—"

একথাগুলির অনেকটা কি পরমহংসদেব বিষয়ে প্রযোজ্য হয় না? কার্লাইলের সঙ্গে পরমহংসদেবের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও কিছুটা দেখা যায়।

* হাজরার অভ্যাস ছিল অপ্রিয় কথা বলা; পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, ধনীর ছেলে দেখে সুন্দর ছেলে দেখে তুমি ভালবাস। (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২৩৯ পৃঃ।)

লীলাপ্রসঙ্গকারের যে বোধটুকু থাকিলে তিনি উহা (যদি সত্যই হয়) চাপিয়া যাইতেন; ত' তো করেনই নাই, বরং ইহার উপর অবতারত্বের বনিয়াদ গাঁথা হইয়াছে!

আঘাত দিয়া কথা বলা—তথা শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে মিল না রাখিয়া কথা বলারও একটি উদাহরণ দিতেছি।

অধরবাবু জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাঁর বাড়ীতে পরমহংস সশিষ্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

"মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে ঠাকুর বলিতেছেন 'কি গো, তোমরা খেতে যাবে না?' তাঁহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন "আজ্ঞা, আমাদের থাক্।" শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) এঁরা সবই কচ্ছেন শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।* একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ, এই সব। এখন হরিনাম তো করতে হবে? কিন্তু হরে কৃষ্ণ বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—

ফরে কৃষ্ট ফরে কৃষ্ট কৃষ্ট কৃষ্ট ফরে ফরে।

ফরে রাম ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে।।"

কতদূর নামিলে এরূপ কথা একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধুর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, তাহা কথামৃতকারের না বুঝিবারই কথা। কেননা তিনি ইতঃপর বলিতেছেন "অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল।" (কথামৃত ৪র্থ ভাগ—১৫০ পৃঃ)

---

* পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে এই মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় নিতান্ত দুরাচার ছিলেন। কথামৃতের চতুর্থভাগ ২৩৯ পৃষ্ঠায় ভাইটি বড় বেশ সরল, একথা বলা হইয়াছে—তবে ছোট ভাইটিকে 'কৃপণ' বলিয়া একটু নিন্দা করা হইয়াছে, এইমাত্র। তাহা হইলে 'এঁরা সবই কচ্ছেন' এরূপ উক্তি কেন?

এখানে বলা আবশ্যক যে ৺রামচন্দ্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবন-চরিতেআছে (এবং তাহা আমি পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় ১ম প্রবন্ধে উদ্ধৃতও করিয়াছি)—"তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্র ভোজন করিয়া অশেষ প্রীতিলাভ করিতেন ; কিন্তু এরূপ স্থলে তিনি বর্ণানুরূপ ব্যবস্থা করিতে কহিতেন।" ইহার সঙ্গে কথামৃতের উপরি উক্তাংশের সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে অধমের বাড়ীতে ভোজন তাঁহার শেষ অবস্থার ঘটনা—তখন সঙ্গদোষে তিনি "সব-লোট" হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কেননা তখন যাঁহারা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে যুটিয়াছিলেন—তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ফেরতও কেহ কেহ ছিলেন—তাঁহারা প্রায়শঃ শাস্ত্রাচারে পরাঙ্মুখ ছিলেন। * সে যাহা হউক "প্রমাদাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি"—এই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি ঔদাস্তের ফল পরমহংস (পীড়াগ্রস্ত হইয়া) ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের (এবং তদুপলক্ষে পরমহংস দেবের শিষ্যশাখার) বিষয়ে আলোচনা করিব। সর্ব্বপ্রথমে ৺রামচন্দ্র দত্তই বিস্তারিতভাবে পরমহংসের জীবনচরিত ও উপদেশাবলী প্রচার করেন—যদিও তৎপূর্ব্বে অপর কেহ কেহ সামান্ত ভাবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বাবুর লেখার দ্বারা পরমহংসের নামযশঃ খুবই বিস্তৃত হয়। তিনি বোধ হয় সর্ব্বাদৌ পরমহংসকে 'অবতার' বলিয়া খ্যাপিত করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ যখন হঠাৎ চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসম্মিলন সভাতে বক্তৃতা দিয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতেই তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম

* অবশ্য সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার না থাকিলেও, তাঁহারা যত্রতত্র ভোজন করিয়া আধ্যাত্মিক পাতিত্যপ্রাপ্ত হইবেন এটাও সদাচারানুমোদিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভারতবর্ষ—এমন কি পৃথিবীময় সুপ্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারাও পরমহংসের নাম জনসাধারণের মধ্যে খ্যাপিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়া কেবল যে নিজে যশস্বী হইয়াছিলেন এমন নহে—হিন্দুধর্মের একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা বেশ কৃতিত্বসহকারেই তিনি ঐ সভায় সমবেত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে করিয়া ছিলেন—তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টান অধিবাসীদের নিকটে হিন্দু-ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ব্যাপারে তিনি, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বক্তৃতা শক্তি প্রভৃতি দ্বারা, বিশিষ্ট অধিকারী হইলেও, এই দেশে সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্মাবলম্বিগণের নিকটে ধর্মব্যাখ্যায় তিনি শাস্ত্রসম্মত অধিকারী ছিলেন না, একথা বলিতেই হইবে।

ধর্ম্মময় মহাক্রমের 'মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্, তন্নিঃশ্বসিত স্বরূপ বেদ (এবং বেদমূলক শাস্ত্রজাত) ও বেদজ্ঞ শাস্ত্রব্যখ্যাতা ব্রাহ্মণ—এই তিনের উপরেই সনাতনধর্ম্মের ভিত্তি। ভগবত্তত্ত্ববেত্তা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই "আপনি আচরি ধর্ম্ম" জগৎকে শিক্ষা দিবেন—তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

আজকাল কলির প্রভাবে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ বিরল হইয়া পড়িয়াছেন—সন্দেহ নাই; তবে বোধ আমা না হউক কিয়ৎ পরিমাণে তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—এবং তাঁহারাই সনাতনধর্ম্ম প্রচারের অধিকারী। গায়ের জোরে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিবিশেষ সন্ন্যাসীর উপাধি ও পোষাক নিয়া অগভীর শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবে

যাহা প্রচারিত হইয়া থাকে—তাহা হয়তো আজকালকার ধর্মোপদেশ-বিহীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত ধর্মাচারবিহীন ব্যক্তিগণের নিকট উপাদেয় হইতে পারে—এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিদেশীর লোকের কাছেও বেশ বিকাইতে পারে; কিন্তু এদেশের যাঁহারা সদাচারনিষ্ঠ যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, তাঁহাদের নিকটে, উহা অকিঞ্চিৎকর—এমন কি অনিষ্টসূচক বলিয়াই প্রতীত হইবে।

বিবেকানন্দের জীবনচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আবাল্য তিনি হিন্দুচিত আচারের অপক্ষপাতী ছিলেন—তাঁহার পিতাও নাকি আচার বিষয়ে বিচারশীল ছিলেন না। পঠদ্দশাতেই বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, ৺ কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় বক্তা হইবেন এরূপ আকাঙ্ক্ষাও পরিপোষণ করিতেন। পরমহংস-দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও আচারে ব্রাহ্ম-ভাবের বিশেষ কোনও ব্যত্যয় দেখা যায় নাই; এমন কি গান করিতে বলিলেও তিনি প্রায়শঃ 'ব্রহ্মসঙ্গীত'ই ধরিতেন। যখন তিনি পরমহংসদেবের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন তখন পরমহংসের নামযশঃ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ প্রশংসাবাক্যকে বিষবৎ ভাবিয়া পরিহার করিবে। বিশেষতঃ, যিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহার পক্ষেতো এসব অতীব হেয়। তাই পরমহংসের সে সময় অবধি অবনতির সূত্রপাত ঘটে—এবং বিবেকানন্দ প্রভৃতির সমাগমে ঐ অবনতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে—সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিবেকানন্দ কায়স্থ (অর্থাৎ সৎশূদ্র) হইলেও (অধিকার বিহীন হইয়াও) সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সমাজে আজকাল যে সব 'বাবু-সন্ন্যাসী' (বা সন্ন্যাসী সাহেব) দেখা যায় তাঁহাদের আদর্শ অনেকটা বিবেকানন্দই বটেন—যদিও তাঁহার পূর্ব্বেও তাদৃশ সন্ন্যাসী কেহ ছিলেন না একথা

বলা যায় না। সে যাহা হউক বিবেকানন্দ ঘোরতর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন—শাস্ত্রগুলিও ব্রাহ্মণ-প্রণীত বলিয়াই তাঁহার নিকট হেয়রূপে পরিগণিত হইত। * তাই তিনি শাস্ত্রের বিধিনিষেধের ধার ধারিতেন না; যে ধর্মে খাদ্যাখাদ্যের বিচার আছে, তাঁহার নাম 'হাঁড়ি-ধর্ম'—যাহাতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিধান আছে, তাহার নাম "ছুঁৎমার্গ"। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় একেই লোক শাস্ত্রাদেশ পালনে পরাঙ্মুখ, ইহার উপর এ সকল "সন্ন্যাসী"—"অবতার" বিশেষের দোহাই দিয়া—এরূপ সব কথা বলিলে সহজেই লোকের—বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুবকদিগের—চিত্তাকর্ষণ হইবার কথা। ফলতঃ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের এ ভাবেই বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে।

সে যাহা হউক বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন বটে, কিন্তু পরমহংসের উক্তিসমূহ হইতে আমরা তাঁহার যাদৃশ উপদেশ লাভ করি, বিবেকানন্দ (এবং তাঁহার দল) অনেক ব্যাপারেই তদন্যথা আচরণ ও প্রচার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে বিবেকানন্দের কীর্ত্তি 'রামকৃষ্ণ মিশন' সম্বন্ধেই বলিতেছি। পরমহংস শম্ভুমল্লিককে বলিয়াছিলেন "... ... এটা যেন মনে থাকে যে তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়। * * ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু; তাঁকে লাভ হইলে আবার বোধহয় তিনিই কর্ত্তা আর আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভহ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি হইতে পারে।" কথামৃত ১ম ভাগ

* বিবেকানন্দের অভিধানে ব্রাহ্মণের প্রতিশব্দ ছিল "দুষ্ট পুরুত"; তিনি মান্দ্রাজী শিষ্যের নিকট পত্রে লিখিয়াছেন "দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এত পায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে।" পত্রাবলী ১ম ভাগ ৪১ পৃষ্ঠা।

১২৭ পৃঃ। পরন্তু বিবেকানন্দ করিলেন রামকৃষ্ণ 'মিশন' (মিশন শব্দটাও লক্ষ্যের বিষয়), যাহাতে প্রধানতঃ "হাসপাতাল ডিস্পেন্‌সারি"র কার্য্যই হইতেছে। এই 'মিশন' খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অনেকটা মুক্তি-ফৌজের ধরণে স্থাপিত—যদিও বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দ-মঠের'ও যেন কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ, সন্দেহ নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার দ্বারা সামাজিক অনিষ্ট এই হইতেছে যে, অপরিণতবয়স্ক বালকগণ মাতা পিতা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছে। ইংরেজী একটা কথা আছে—Charity begins at home: আগে স্বগৃহের অভাব দূর কর—তারপর পরোপকার করিও। পরন্তু আমি জানি, যে ছেলেটিকে বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন মনে করিয়া কষ্টেসৃষ্টে পিতা লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, যে বিবাহ করিয়া বংশধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে ভাবিয়া পিতামাতা ভরসা করিতেছিলেন—সে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়া ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া গেল!! যাঁহারা পুরাণে কৃতবোধের উপাখ্যান পড়িয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে যোগযাগ তপস্যাদি অপেক্ষাও মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আধ্যাত্মিক সমধিকউন্নতি সাধিত হয়। গৃহস্থ আপনার কর্ত্তব্য করিয়া অবশ্যই সাধ্যানুসারে পরের উপকার—সমাজের হিতসাধন করিবেন; এবং আমাদের সমাজবন্ধন যে ভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি স্বতঃই হইয়া থাকে। ছেলে জন্মিল, জনক জননীর ন্যায় জ্ঞাতিদেরও জননাশৌচ হইল; পিতা মরিলেন, পুত্রের ন্যায় জ্ঞাতিদেরও মৃতাশৌচ হইল—দহন বহনাদি করুন আর নাই করুন। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কেহ মরিলে সকলে মিলিয়া বহন করিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া দাহকরা হয়—শ্রাদ্ধে সকলে সহায়তা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করে। তখন বৈষয়িক বিবাদ বিসংবাদ থাকিলেও ঐ সব ভুলিয়া একে অন্যের সাহায্যে রত হয়।

এ কেবল জাতির মধ্যেই যে তাহা নয়; ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই আপদ্‌বিপদে পরস্পরের সহায়তা করা সমাজের লোকের একটা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তবে এখন ক্রমশঃ ধর্ম্মলোপ বশতঃ সমাজ পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটাতে কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব দেখা যাইতেছে। অতএব দেখা গেল, পরোপকার আমাদের সমাজের মজ্জাগত ভাব—সে ভাব বর্দ্ধিত করিতে গেলে ধর্ম্মভাব যাহাতে বাড়ে—শাস্ত্রে বিশ্বাস, পিত্রাদি গুরুজনে ভক্তি, সদাচার পরিপালন ইত্যাদি যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় হয়—তদর্থে যত্ন করাই স্বধর্ম্ম পরায়ণ সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা তাহা হইতেছে কি? বরং অনধিকারে সন্ন্যাস গ্রহণ অথবা বিবাহ না করিয়া আশ্রমবিরোধী আচরণ ইত্যাদি দ্বারা সমাজের অনিষ্টই সাধিত হইতেছে। মিশনের যুবকদলের অনেককেই চা চুরুট মৎস্য মাংস ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যবিরুদ্ধ জিনিসের উপভোগ করিতে দেখিয়া উঁহাদের জীবনের পরিণাম শুভ হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।

দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন মহামারী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সময়ে মিশনের দ্বারা উপকার যথেষ্ট হইয়াছে; এসকল নৈমিত্তিক উপদ্রবের সময়ে যাহাতে আপামর সকলেই পরস্পর সহানুভূতি দেখাইয়া যথাসম্ভব সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য সমাজের লোকদিগকে প্রস্তুত করা উচিত। তজ্জন্য একটা "মিশন" করিয়া তাহাতে যুবকদিগকে আপনাপন সমাজের ও পরিবারের ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই; এবার উত্তর বঙ্গে জলপ্লাবনে যেভাবে লোক-সাধারণ সহায়তা করিয়াছে—তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে একটা 'মিশন' এতদর্থে অনাবশ্যক। * সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসভাজন একজন মাত্র মহাপ্রাণ ব্যক্তি—তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তই হউন বা স্যার প্রফুল্লচন্দ্রই হউন—ঈদৃশ

* বরং রামকৃষ্ণমিশন এবার (১৩২৯ সালে) সুনামও রাখিতে পারে নাই। সম্পাদক "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় যে পত্র ছাপাইয়াছেন তাহাতে অনেকেই মিশনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন।

বিপৎকালে দাঁড়াইলেই তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া শতসহস্র ব্যক্তি সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবে—তজ্জন্য কায়েমী ব্যবস্থার—মিশন ইত্যাদির—কোনও প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ বিবেকানন্দ ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা রাজনীতির প্রচার কার্য্যের সমধিক উপযুক্ত ছিলেন—সে দিকে কিছুটা কাজও তিনি করিয়াছেন বলা যায়। তাঁহার প্রকৃতিতে সাত্ত্বিকতা অপেক্ষা রাজসিকতাই প্রবল ছিল; ইহার প্রমাণ স্বরূপ তদীয় জীবনচরিত, পত্রাবলী ও বক্তৃতা হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে—কিন্তু তাহা হইলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কৌতূহলী পাঠক "সাহিত্য" পত্রে তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী * পড়িয়া দেখিতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পরে যাঁহাদের নাম ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাহাত্ম্যখ্যাপনকারিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের লেখক গুপ্তনামা 'শ্রীম—' সর্ব্বাদৌ উল্লেখ যোগ্য।

কথামৃতকার শ্রীম—মহাশয় শুনিয়াছি একজন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু তিনি যে একজন চতুর চূড়ামণি তাহা এই কথামৃতের প্রকাশপদ্ধতি হইতেই অনুমিত হইতেছে। তিনি ১৮৮১ কি ৮২ খৃষ্টাব্দে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেন ও তদবধি তাঁহার সঙ্গে যখনই একত্র হইতেন তখনই যাহা যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন নোট্ করিয়া রাখিতেন। তিনি এই কথা নিজগ্রন্থেই বলিয়াছেন। প্রথম হইতেই ৺রামকৃষ্ণ যে একজন অবতার বিশেষ তাহাও বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার কথাগুলিও যে অমৃতবৎ লোকের প্রিয় ও হিতজনক ইহাও

* সাহিত্য ১৩২৭—ফাল্গুন চৈত্র যুগ্মসংখ্যা। ১৩২৮ বৈশাখ হইতে শ্রাবণসংখ্যা (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) [শ্রাবণ সংখ্যায় প্রতিবাদ আছে, তাহার উত্তর ঐ সালেরই (১৩২৮) পৌষ সংখ্যায় (এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্ট—ক দেখ) দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—নতুবা নোট্ করিবেনইবা কেন? এস্থলে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, পরমহংসের জীবিতকালে যদিও অনেকে তাঁহার উক্তি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—এই শ্রীম—মহাশয় তাঁহার সঞ্চিত অমৃতভাণ্ড গুপ্তধনের ন্যায় অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন। যদি তখন তিনি কথামৃত প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিতেন—একদিনের ঘটনা পরদিন বা কিছুদিন পরে কোন পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেন, তাহা হইলে অমৃত-পিপাসু আমরা অনেকে ৺পরমহংসের সান্নিধ্যলাভে লোলুপ হইয়া দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদিতে গমন করিতাম—ভক্তসংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইত। এদিকে যাঁরা কিঞ্চিৎ চক্ষুষ্মান্—বিনা পরীক্ষায় কোনও কিছু গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁরাও একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেন কথাগুলিতে সত্য কি পরিমাণ আছে—যেমন এই লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথার তথ্যনির্ণয় করিতে পারিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আর একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুয্যে জপ কর্‌ছে কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম।" কথামৃত ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠা)।

এই কথা ১৮৮২।১৬ই অক্টোবর তারিখের। ইহার কিছুদিন পরেই যদি এটা প্রকাশিত হইত, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ব্যাপারটা ঠিক্ কিনা "জয় মুখুয্যে"কে জিজ্ঞাসা করিতেন। কেননা তখনও "জয় মুখুয্যে" জীবিত ছিলেন। ইদানীং যে সকল ব্যক্তি ইহা পাঠ করেন এবং "জয় মুখুয্যে"কেও চিনিতেন, তাঁহারা এটা অসম্ভব মনে করেন। জয় মুখুয্যে বরাহনগরের ঘাটেই বা কেন জপ করিতে যাইবেন? আর তাঁহাকে চাপড় মারিয়া কেহ যে আস্ত শরীরে পার পাইতে পারিয়াছে—এটা নিতান্তই অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়।*

* তথ্যানুসন্ধানার্থ ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত (ইদানীং স্বর্গত) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরকে চিঠি লিখিয়াছিলাম।

তার পর যাহা তিনি ৺পরমহংসের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত করিতে-ছেন তাহাও তারিখওয়ারি ধারাবাহিকরূপে করিতেছেন না। প্রথম ভাগের (দ্বাদশ খণ্ডে) ১৮৮৪ অব্দের কথা আছে—আবার ২য় ভাগের (প্রথম খণ্ডে) ১৮৮২ অব্দের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ। ইহাতে তিনি নিজের হাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা রাখিয়াছেন, প্রয়োজন মতে নূতন নূতন কথাও আবির্ভূত হইতে পারে—এইরূপই ধারণা জন্মে।

অপিচ সর্ব্বাদৌ যখন কথামৃত কোনও কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন গ্রন্থকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণকে অবতার-রূপে দেখাইবার তেমন প্রয়াস করেন নাই। এমন কি গ্রন্থকার যখন প্রথম কথামৃত পুস্তকাকারে ছাপাইলেন তখনও যথেষ্ট সাবধানই ছিলেন। প্রথম ভাগের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ কালে, প্রথম সংস্করণের ৬ বৎসর পরে (১৩১৪ অব্দে), ভূমিকায় সাহসপূর্ব্বক লিখিলেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ, তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্যসাধন। আর সাধন যদি দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন।" আবার ৪র্থ ভাগের প্রকাশ কালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) "পূজা ও নিবেদন" শীর্ষক ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"ভক্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন—'মা! এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়'। [২২২ পৃষ্ঠা] এই শুভ অঙ্গীকার-বাণী ভক্তদের যেন স্মরণ থাকে।"

উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—"আমার ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আলাপ ছিল। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। বরং তাঁহার সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হয় নাই। আমার পিতা সম্বন্ধে তিনি বা অপর কেহ কোনও কথা বলিলে তাহাতে আমি সুখী বা দুঃখিত হই না—তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-স্বরূপ দেখিতাম।"

এই বাণী অবশ্যই গ্রন্থকার পরমহংসের জীবদ্দশায় শুনিয়াছিলেন—তখন প্রকাশ করিলে এতদিনে অনেকেই যে সিদ্ধ হইয়া যাইত! সিদ্ধ হইবার এই সোজা উপায়টা এতদিনের পর গ্রন্থকার প্রচার করিলেন—ইহাই পরম আক্ষেপের বিষয়!!

কি জানি, কেহ এই 'কথামৃতে' অবিশ্বাস করে, তাই এই ৪র্থ ভাগের (ইহাই আপাততঃ শেষ ভাগ) দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩২১ সালে), সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বেকার শ্রীশ্রী৺মার আশীর্ব্বাদ ছাপাইয়াছেন। মা লিখিয়াছেন "বাবাজীবন—তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোনও ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে আবশ্যক মত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। ... ... ২১শে আষাঢ় ১৩০৪।"

এতদিন পরে এই "সাফাই" উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজনেই বোধ হইতেছে, সন্দেহের বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। 'কথামৃত' আদ্যন্ত যাঁরা পাঠ করিয়াছেন, তাঁরা কিন্তু কদাপি "শ্রীশ্রী৺মা"কে (অর্থাৎ পরমহংসদেবের পত্নীকে) ঐ সকল 'কথা'র মধ্যে উপস্থিত দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ, অথচ তাঁহার কাছ হইতে সার্টিফিকেট্ গ্রহণ করা হইয়াছে!!

পরন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথামৃতের এই গুপ্তনামা লেখক একজন সুচতুর ব্যক্তি—অথচ সুশিক্ষিতও বটেন; তিনি গ্রন্থে পরমহংসের ভাষার যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া এবং কথোপকথন নাটকের রীতিতে সাজাইয়া বেশ স্বাভাবিকতাভাস প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহাতে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হয়—অমৃতে অনৃতের হলাহল কিঞ্চিৎ মিশ্রিত আছে কিনা মোহবশতঃ তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্যও লোপ পায়—

বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুবক পাঠকের পক্ষে। গ্রন্থকার যতই দেখিতেছেন, তাঁহার কথামৃত লোকে বেশ আগ্রহ সহকারে ও অবিচারে গ্রহণ করিতেছে—ততই সাহসও পাইতেছেন, ক্রমশঃ অবতারত্ব খ্যাপনের মাত্রা বাড়াইতেছেন। †

কথামৃতকার তবুও অনেকটা রহিয়া সহিয়া এবং সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ লেখক একেবারে 'বেপরোয়া'—যাহা খুশী লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইয়াছেন—তথ্যানুসন্ধানের ধার যে বিশেষ ধারেন নাই, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বিষয়ক পূর্ব্বে উল্লেখিত কথা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ দেবের অবতারত্ব খ্যাপনই তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—এবং তাহা করিতে গিয়া জুগুপ্সিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই—যথা রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গুরুর নিন্দাবাদ। রামকৃষ্ণকে অবতার বানাইতে হইবে—তাই দীক্ষাগুরু তোতাপুরী, উত্তর সাধিকা ব্রাহ্মণী—ইহাদিগকে পর্য্যন্ত খাটো করিতে হইবে—পণ্ডিত শশধর ইত্যাদি তো পরের কথা! বিবেকবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি যে এরূপ কথায় রামকৃষ্ণের উপরেও বিরক্ত হইতে পারেন—এ বোধও এই 'লীলাপ্রসঙ্গ'কারের নাই। আমার তো বোধ হয় এইরূপ লেখার দ্বারা রামকৃষ্ণ পরমহংসের যশোভাতি মলিন হইয়াছে—গোঁড়ারা যাই কেন মনে করুননা।

তারপর রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় এই অভিনব অবতারের প্রচারকল্পে কেবল যে পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন—এমন নহে, নানারূপ উদ্ভট ছবিও ছাপাইয়াছেন; ফেরিওয়ালারতো অভাব নাই—নানা স্থানে 'মিশন' বা সেবাশ্রম রহিয়াছে, উহাদের প্রধান কার্য্য এ সকল বিক্রয়

† কথামৃত রচয়িতার অন্তর্য্যামিত্ব গুণও আছে, যথা—"মণি চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর "সূর্য্যোদয়ের সূর্য্য" আর 'অটীনে গাছ' এই সব কথা যা বল্লেন, এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর কি অবতার?" ইত্যাদি।

করা। এ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ কি মহাদেব প্রভৃতির যে সব ছবি ডিজাইন করা হইয়াছে—তাহা তাঁহাদের লীলা বিশেষ অবলম্বনে—যেমন কালীয়-দমন বা মদনভস্ম। এমন কি শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ও গৌরাঙ্গের জীবনের ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে ছবি প্রকাশ করিয়াছেন—যেমন নগর-সংকীর্ত্তন, অথবা সার্ব্বভৌম নিকটে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ। পরন্তু এই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় সঙ্গতি অসঙ্গতি এ সকলের ধার বড় ধারেন না—পরমহংসের কোনও জীবনচরিত বা 'লীলা'প্রসঙ্গে যে বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহা ছবিতে প্রকটিত করা হইয়াছে। তাদৃশ একটি ছবির বর্ণনা দিতেছি—ইহা বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণ যোগারূঢ় অবস্থায় বসিয়া আছেন, উপরে ওঁকারভেদ করিয়া হৃদ্‌পদ্মবিলাসিনী শ্রীশ্রীশ্যামামূর্ত্তি বিরাজমানা; ভাবটি অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, কেননা ইহাই রামকৃষ্ণের ধ্যেয়-মূর্ত্তি। কিন্তু তাঁহার দুই দিকে চারিটি মূর্ত্তি আছেন—একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী (পার্ব্বতী) অপর দিকে রাধিকা ও মহাদেব। কৃষ্ণের বামহস্ত এবং রাধার দক্ষিণ হস্ত রামকৃষ্ণের মস্তকে সংস্থাপিত; ভগবতী * কৃষ্ণের পেছনে দাঁড়াইয়া স্বীয় হস্ত তাঁহার বাহুমূলে রাখিয়াছেন—এবং মহাদেব রাধার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তাঁহার [অর্থাৎ রাধার] বাহুমূল দুইটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন!

প্রথম কথা এই যে যোগের অবস্থায় সাধকের চিত্তবৃত্তি ইষ্টে বদ্ধলক্ষ্য হয়—তখন বস্তুন্তর তাঁহার ভাবনার বিষয়ীভূত হইতেই পারে না—কেননা, তাহা হইলে সাধক ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়া

* প্রথমতঃ আমি 'ভগবতী'কে লক্ষ্মী ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু কোনও বন্ধু আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেন। কেননা, তাহা হইলে নারায়ণ লক্ষ্মীর অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট হইয়া পড়েন (নারায়ণের মাথা স্ত্রীমূর্ত্তির চিবুক স্পর্শ করিয়াছে)।

পড়েন। রামকৃষ্ণ অবশ্যই ওঁকার [ইহা কি শক্তি-বীজ?] ভেদী স্বীয় ইষ্ট শ্যামামূর্ত্তিতে ধ্যানবদ্ধচিত্ত ছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে অবশ্যই চিন্তা করেন নাই,—তাঁহারা তবে অনাহূতভাবে আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া কি ধ্যান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন? দ্বিতীয়তঃ, সাধকের মস্তকোপরি তো শিবশক্তি রহিয়াছেনই—তাঁহারা আবার তখনই আসিয়া রাধা ও কৃষ্ণের পেছনে দাঁড়াইলেন কিরূপে? তৃতীয়তঃ আমাদের দেবীরা (বিশেষতঃ ভগবতী) সতীত্বের আদর্শ ভাবেই বর্ণিত—লীলাচ্ছলেও অপর পুরুষ দেবতার গাত্র সংস্পর্শে কদাপি আসেন না—এই চিত্রে রাধা ও ভগবতীর এইরূপ বিড়ম্বনা প্রকৃত হিন্দুর নিকটে বড়ই আপত্তিজনক। * অথচ এই ছবি বেশ বিকাইতেছে। এই চিত্রটির নামকরণ হইয়াছে—"মিলিলাভ"; তাহা হইলে পরমহংসকে সহজ অবস্থায় চিত্রিত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতির উপাস্য সমস্ত দেবদেবীকে—এমন কি খ্রীষ্ট ও মহম্মদকে পর্য্যন্ত—দণ্ডায়মান করাইলেই বরং শোভন হইত।

এ তো কল্পিত ছবি; বিবেকানন্দের জীবনচরিতে আছে, আবাল্য তাঁহার কপালে একটা কাটার দাগ ছিল—গোহাটিতে তাঁহার মৃত্যুর বছর খানিক আগে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম—ঐ দাগটিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু বিবেকানন্দের কোনও ছবিতে এই দাগটা দেখা যায় না। এই সামান্য বিষয় হইতেই এতৎসম্প্রদায়ের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের বিশেষ পরিচয় "সাহিত্য"পত্রে মদীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবার সময়েও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধগুলিতে আমি নিজের বক্তব্য যথাসম্ভব সাবধানে বলিয়াছি—সমস্ত কথাই

* এই ছবির কল্পনাটি বিলাতী ঢংএর; সাহেবী সমাজে পরস্ত্রীকে বগল-দাবা করাটা নাকি শিষ্টাচার সম্মত!

পরমহংসদেবের তথা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত প্রভৃতি ঐ সম্প্রদায়ের লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থ হইতে স্থলবিশেষের নির্দ্দেশ ক্রমে প্রমাণিত করিয়াছি। ইহাদের পক্ষ হইতে যে সব প্রতিবাদ হইয়াছিল—তাহাতে যুক্তিতর্কের ভাগ অতি কমই ছিল—ছিল প্রভূতপরিমাণে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ও গালাগালি! 'সাহিত্য'পত্রে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হওয়াতে, ঐ পত্র 'বয়কট্' করার চেষ্টাও হইয়াছিল! 'সাহিত্যের' সম্পাদক মহাশয়ও, "আলোচনা ও বিচারের উদ্দেশ্যে" আমার প্রবন্ধাবলী ছাপাইয়াছিলেন; পরন্তু তিনি হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, 'প্রতিবাদের ভঙ্গী দেখিয়া, গালাগালির বহর বুঝিয়া, সাহিত্যকে বয়কট্ করিবার আলোড়ন শুনিয়া বুঝিলাম, তাহা হইবার নহে। অতএব ... —র অশেষ পরিশ্রমজাত এই সংগ্রহ থাকুক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত। যদি আবার জীবন হয়—আবার মানুষ দেখা দেয়, তখন প্রকৃত উত্তর পাইব।" ইত্যাদি (সাহিত্য শ্রাবণ ১৩২৮—৩১৮ পৃষ্ঠা)

ফলকথা এই সম্প্রদায়ে প্রকৃত জ্ঞানী শাস্ত্রাভিজ্ঞ লোকের খুবই অভাব, অথচ গোঁড়ামি যথেষ্ট আছে। এদিকে নামে সন্ন্যাসী হইলেও চালচরিত্রে আহারাদিতে বিলাসী; ব্রহ্মচর্য্যেও চা চুরুট চলে; এইরূপ আদর্শে এদেশের তত্ত্বপিপাসু লোক কখনও আকৃষ্ট হইবে না। তবে বিলাতে বা আমেরিকায় গিয়া হিন্দুধর্ম্মের দু'একটা আধ্যাত্মিক কথা * শুনাইয়া দু'চারজন সাহেব বিবি চেলা করিলে এক শ্রেণীর লোকের

* আমেরিকায় বহুবর্ষ বেদান্ত (?) প্রচার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত কোনও "আনন্দ"কে জনৈক বেদান্তবিৎ পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি বেদান্তের কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উপদেশই বা কি দেন?" তদুত্তরে ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"এই—ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির অনুবাদ দু'একখানি বই পড়িয়াছি—আর 'ঠাকুর' (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ) যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাই বেদ, তাই বেদান্ত। আমরা তাই প্রচার করি।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

নিকট বাহবা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই,—পরন্তু প্রকৃত সমাজহিতৈষী কখনও ইহাতে ভুলিবেন না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পরমহংসদেবের অথবা স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা তৎসম্প্রদায়ের দোষোদ্ঘাটনমাত্র করিবার জন্য এরূপ প্রবন্ধ প্রচার করিতে অধ্যবসায়ী হই নাই—পরন্তু এই সম্প্রদায়ের দ্বারা আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব প্রচারিত হইতেছে, তাই সমাজের জনগণের সাবধানতা বিধানার্থ এই প্রয়াস। কলির প্রাবল্যবশতঃ এতাদৃশ আরো দুই চারিটি সম্প্রদায় এই বঙ্গীয় সমাজে দেখা দিয়াছে; তবে এই রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের ন্যায় ঐগুলি এখনও তেমন বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। আশাকরি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাজ হিতৈষিগণ এসব অভিনব সম্প্রদায় কি ভাবে কতদূর অনিষ্টসাধন করিতেছে তাহা সম্যক্ অবধারণপূর্ব্বক সাবধান হইবেন—এবং যথাসম্ভব এই গুলির প্রশ্রয় দানে সর্ব্বথা বিরত থাকিবেন।

ব্রহ্মণ্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কল্যাণবিধান করুন এবং তদর্থে আমাদিগকেও সামর্থ্য প্রদান করুন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

খ। "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়"

প্রবন্ধের প্রতিবাদের সমালোচনা।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্যব্যাকরণ-ন্যায়তীর্থ)

বিগত ১৮৩৪ শকের মাঘমাসের 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ লিখিত "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ* প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামধের জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া

* দ্বিতীয় পরিশিষ্ট—ক দ্রষ্টব্য।

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "ব্রাহ্মণসমাজে" এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনিই লিখিয়াছেন যে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের আচরণে সদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্মে কিছু কিছু আঘাত পড়িতেছে, তবে তিনি "কিছু কিছু" বলিয়াছেন—আমরা তাহা মনে করি না। প্রকাশ্য শত্রু (ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টিয়ান্) বরং ভাল কিন্তু হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া হাঁড়িধর্ম্ম কুসংস্কার বলিয়া খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করা, অনধিকারীর ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা, আচার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি দেওয়া, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণবিদ্বেষ এবং পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা ইত্যাদি হেতু রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় আর্য্যসমাজীদের ন্যায় সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে। এতদিন এই সম্প্রদায় বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজ অনভিজ্ঞ ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাদির অথবা রামকৃষ্ণকথামৃত লীলাপ্রসঙ্গাদির ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বড় একটা কিছু খোঁজ খবর রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, * নচেৎ এতদিন পণ্ডিত মহাশয়গণ—তথা স্বধর্ম্মপরায়ণ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গ—এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকিতেন না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঐ সম্প্রদায়ের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সনাতন সমাজের পক্ষ হইতে যেরূপ দক্ষতাসহকারে "সাহিত্য" পত্রে প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক প্রতিবাদকারীর উত্তর যেরূপ অকাট্যভাবে দিয়াছিলেন, তাহাতেই আহ্লাদিত হইয়া বোধ করি 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্-এ, মহাশয় "ব্রাহ্মণসমাজের"

---

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া যে "চাপরাশের" কথা এতদিন চলিয়াছিল, তিনি তাহার খবরই রাখিতেন না। গত ৩।৪ বৎসর হইল তাঁহার নিকট এ কথা উত্থাপিত হইলে পর তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

জন্ত একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং তৎফলেই এই পত্রে "৺রামকৃষ্ণ পরমহংসও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রতিবাদী ভাগবত ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রের প্রতিও মন্তব্য প্রকটন করিতে ছাড়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস বর্ণাশ্রম বিরোধী এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিয়া বিদ্যাবিনোদমহাশয় সমগ্রব্রাহ্মণসমাজের তথা সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসী সদাচার পরায়ণ হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। বরং আমরা অনুরোধ করিতেছি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহারপ্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাহাতে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য সমাজে সুপ্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মও সমাজের উপর আঘাত পড়িতেছে—ভাগবত মহাশয় ইহা স্বীকার করিতেছেন—তথাপি এতদিন কৈ এবিষয়ে তিনি কোনও বাঙ্‌ নিষ্পত্তি কোথাও করিয়াছেন বলিয়া তো আমরা অবগত নহি। তিনি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে যে ভাবে লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি সে ভাবেও তো প্রবন্ধ লিখিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত অভিনব মতের সহিত শাস্ত্রের এক-বাক্যতা সাধন করিতে পারিতেন—তাহা করিয়াছেন কি? আশা করি এখন হইতে তাহা করিবেন—এবং ঐ সম্প্রদায়ের মুখপত্র উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার সামঞ্জস্য বিধায়ক প্রবন্ধ যেন আমরা দেখিতে পাই।

তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন "আমি রামকৃষ্ণ মিশনের চেলা নই।" আমরা ব্রাহ্মণের বাক্য একেবারে মিথ্যা বলিব না, তিনি মিশনের চেলা না হইলেও তাঁহার প্রতিবাদের ধরণে বোঝা যায়, যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরোধী দলের আওতায় পড়িয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের চেলা নহেন কিন্তু রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত অথচ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরাগ সদ-

ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, ভাগবত মহাশয় কিন্তু সেরূপ নহেন, তিনি একটু বেশী চাপা পড়িয়াছেন। মিশনের চেলার মধ্যেও এমন দু একজন এখনও আছেন যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অনুরক্ত, ভাগবত মহাশয় সেরূপ চেলা হইলেও ভাল ছিল, কিন্তু তিনি সেরূপও নহেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি শিখণ্ডী ভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন—পশ্চাতে কোনও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী ধনঞ্জয় অবস্থিত হইয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন!

তাই বর্ণাশ্রম বিরোধী যাঁহারা এযাবৎ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহাদের কতকগুলি লক্ষণ আমরা ভাগবত মহাশয়ের প্রবন্ধেও দেখিতেছি; ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি—

(১) যাহা প্রকৃত নহে তাহা বলা। যথা, "তাঁর (পরমহংসের) কাছে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ই ছুটিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পরমহংসদেব তাঁর কাছে কোন দিন যান নাই।" এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে প্রবন্ধের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতেই আছে "একজনের বাড়ী গিয়া (তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন ভূধর বাবুর বাড়ীতেই ছিলেন) তাঁহাকে চাপরাশ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা অস্বাভাবিক ও অতি অভদ্রতা। পরমহংস তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না।" ইত্যাদি (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)। "সাহিত্যে" যে প্রবন্ধ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল, * তাহাতে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ পত্রে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে পরমহংসই তাঁহার নিকটে প্রথম আসিয়াছিলেন—পরে তিনি গিয়াছিলেন। এরূপ মধ্যে মধ্যে পরমহংসও তাঁহার নিকটে আসিতেন, তিনিও পরমহংসের নিকট যাইতেন।

* এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) দোষ ঢাকিবার জন্য ধাপ্পা দেওয়া। যথা—"মহাপ্রভু যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না বলিয়া বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন সেটি তাঁহার লীলা আলোচনা না করিবারই ফল, আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাহার ভূরি প্রমাণ দেখান যাইবে।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাবধানে বলিয়াছেন, "চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।" ইহার উত্তরে ভাগবত মহাশয় স্বীয় প্রতিবাদ সমর্থনার্থ দু একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেই শোভন হইত। তাহা তিনি করেন নাই ভবিষ্যতের জন্য মুলতোবি রাখিয়াছেন। ৺শিশির ঘোষ প্রভৃতির আধুনিক গ্রন্থে তো চৈতন্যগুরু ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বলা হইয়াছে—তাদৃশ কোনও গ্রন্থে মহাপ্রভুও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা থাকিতে পারে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহারও নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।

এইরূপ চাপরাশের কথাও স্বকর্ণে শুনিয়াছে এরূপ লোক এখনও আছে বলিয়া এক প্রতিবাদী খুব জোরে বলিয়াছিলেন—তারপর এখন তো আহ্বান করিলেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! *

(৩) চতুরতা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সর্ব্বদাই পরমহংসের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে একাধিকবার একথা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি তাঁহার উপর 'বিদ্বেষের অভিযোগ' চাপান হইয়াছে; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয় প্রবন্ধের

* ভাগবত মহাশয় প্রকারান্তরে চাপরাশের কথা তুলিয়াছেন কিন্তু "তুমি যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছ, চাপরাশ আছে?" এরূপ জিজ্ঞাসা, আর কথাপ্রসঙ্গে "তাঁর কাছ থেকে শক্তি না পেলে কিছুই হয় না" এরূপ বলা, কি সমান কথা? প্রকৃতপক্ষে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু দর্শন" গ্রন্থে অথবা তৎসম্পাদিত "বেদব্যাস" পত্রে আছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত (প্রথম পরিশিষ্ট ক) প্রবন্ধেও এসব কথা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

উপসংহারে "ঘোষোদ্‌ঘাটন" মাত্র করিবার জন্য যে প্রবন্ধ লেখেন নাই, তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণকে সাবধান করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একথা বলাসত্ত্বেও—চালাকি করিয়া কোন কারণ না দর্শাইয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়া, প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সার (?) সংকলন পূর্ব্বক, "জগৎপূজ্য ব্যক্তিকে 'সবলোট' 'স্নায়ুবিকার গ্রস্ত' 'পাপাচারী' 'পথভ্রষ্ট' 'অধঃপতিত' ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত করিয়াছেন" এরূপ অভিযোগ তাঁহার উপর আনিয়াছেন। এক 'সবলোট' ভিন্ন আর সব বিশেষণ তো বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে খুঁজিয়া আমরা পাইলাম না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নার্ভাস (nervous) বলিয়াছেন—* ইহার তরজমা হইয়াছে 'স্নায়ু বিকারগ্রস্ত'। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি সুন্দরভাবে পরমহংসের কথা লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীজগদম্বার অপার করুণার পাত্র তাঁহার এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা শূন্য সরলপ্রকৃতির ছেলেটির পা পিছলিয়াছিল কিন্তু তিনি তাঁহাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেন নাই—তবেকিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক অবনতি ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগাইয়া পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া ছিলেন।" (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।) বলি, ইহাতে 'বিদ্বেষ ভাব' প্রকাশিত হয় কি? "পাপাচারী পথভ্রষ্ট অধঃপতিত" ইত্যাদি বিশেষণ এরূপ লেখা হইতে আহরণ করা যায় কি? ফলকথা, এরূপ 'চালাকি' না করিলে তো বিষয়টা ঘোরালো করা যায় না—পরমহংসের প্রতি কটূক্তি করা হইয়াছে এরূপ না দেখাইলে তো বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি গালি বর্ষণের সুবিধা হয় না!

(৪) কোন কিছুর অনুসন্ধান করিয়া লেখার অসামর্থ্য। "হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র্ ফড়র্ ক'রে বকে"—এই কথা পরমহংস বলিয়া-

* বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নার্ভাস্ মাত্র বলিয়াছেন; ব্রাহ্ম প্রচারক ৺শিবনাথ শাস্ত্রী তদীয় "আত্ম-চরিতে" স্পষ্টই ইহা "পীড়া" বলিয়াছেন।

ছিলেন, ভাগবত মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে—ইহা স্বয়ং কথামৃতকার বলিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ "৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে" "জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়" লিখিয়া সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন "শাস্তরসাস্পদ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি। নানা-কারণে এ বিষয়ের আলোচনা বাড়াইতে চাইনা—কিন্তু ভাগবত মহাশয় ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (তথা তদীয় পুত্র ৺প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়) সম্বন্ধে যে কিছুই জানেন না, বা জানিবার চেষ্টাও করেন নাই—ইহাই প্রতীত হইতেছে।

(৫) বুঝিবার অক্ষমতা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছিলেন "সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার না থাকিলেও তাঁহারা যত্রতত্র ভোজন করিয়া আধ্যাত্মিক পাতিত্যগ্রস্ত হইবেন, এটাও সদাচার অনুমোদিত নহে।" ভাগবত মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—"সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার নাই, একথা বলিলেন, আবার যত্রতত্র ভোজন করিলে পাতিত্য জন্মে ইহাও বলিলেন, ইহার সামঞ্জস্য কি?" এস্থলে পাতিত্যের পূর্ব্বে 'আধ্যাত্মিক' কথাটি ছাড়িয়া দিয়াই গোল বাধাইয়াছেন। 'সামাজিক' 'পাতিত্য' সন্ন্যাসীর নাই—কেননা তাঁহারা গৃহস্থ-সমাজের বাহিরে। কিন্তু "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" এই বাক্যের বিষয়ীভূত সন্ন্যাসীও বটেন; তাই নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতাবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সন্ন্যাসীও যত্র তত্র যা তা খান না, তবে নব্য সম্প্রদায়ের 'আনন্দ' বর্গের কথা স্বতন্ত্র, ইহারা প্রকৃতই 'সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র'।

(৬) শাস্ত্রের দু'একটা বোল চাল প্রকটন—কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্বে অপ্রবেশ। ঋষিবাক্যে বা ভগবদ্বাক্যেও অসঙ্গতি আছে, অতএব রামকৃষ্ণের বা বিবেকানন্দের আচরণে ও কথায় না থাকিবে কেন? এইরূপ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবত মহাশয় কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তেও তিনি "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।" ইত্যাদি

ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেদিন নৈহাটি-সাহিত্যসম্মিলনে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দর্শন শাখায় সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্' ইত্যাদি বাক্যের কি সুন্দর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন—ভাগবতমহাশয় তাহা দেখিয়াছেন কি? সে যাহা হউক, শাস্ত্রের নানা স্থলে আপাত বিরোধ সূচক কথা দৃষ্ট হয়, অতএব রামকৃষ্ণ বা তৎসম্প্রদায়ের কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য থাকিবে, ইহা কি যুক্তি? শাস্ত্রেরও তো আপাত বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য বিধান হইয়া থাকে—ইঁহাদের দু একটা পরস্পর বিরুদ্ধ কথার বা আচরণের সামঞ্জস্য ভাগবত মহাশয় দেখাইলেন কোথায়? সেটা দেখাইয়া পরে শাস্ত্রের নজির আনা উচিত ছিল।

(৭) রামকৃষ্ণাদি সম্বন্ধে অত্যুক্তিবাদ। ভাগবত মহাশয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে "রামকৃষ্ণকে একজন অবতার বলিয়া সকলে স্বীকার না করিলেও তিনি যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ এসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই।" আমরা তো অবতার দূরে থাকুক রামকৃষ্ণ যে একজন 'সিদ্ধ মহাপুরুষ' ছিলেন ইহাও সম্যক্ স্বীকার করিতে পারি না। "বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই" একথা তাঁহার অত্যুক্তিবাদ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজা প্যারীমোহন, প্রভৃতি (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথা নাই বলিলাম) অনেকেই তো তাঁহাকে তাদৃশ মনে করেন না—বিবেকবান্ শাস্ত্রদর্শী কেহই ঐরূপ মনে করিবেন না। "স্বাধীন কুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ"—এটা মস্ত কথা। যে ব্যক্তি পীড়ায় ভুগিয়া, যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া, ডাক্তার প্রভৃতির তথা শিষ্যাদির দীর্ঘকাল চিকিৎসাও সেবা শুশ্রূষার অধীন হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহাকে সিদ্ধমহাপুরুষ বলা ঐ সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু বিচারশক্তি যাদের আছে তাঁরা একথা বলিবেন না—'অবতার' বলা তো নিতান্তই হাস্যাস্পদ

বিষয়। * শুনিয়াছি পরমহংস নিজেও বলিতেন, "অবতারের কি ক্যানসার হয় গা?"

তারপর বলা হইয়াছে "রামকৃষ্ণসম্প্রদায় যে প্রসার লাভ করিয়াছে শত শত মহামহোপাধ্যায়ের চীৎকারেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না, কেবল চীৎকার করিয়াই গলাভাঙ্গিবে।" "শত শত" দূরে থাকুক একজন "মহামহোপাধ্যায়ের" লেখার চোটেইতো দেখিতেছি সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ। যদি 'বিন্দুমাত্র ক্ষতি' না হয় তবে "সাহিত্য" পত্রের পেছনে এই সম্প্রদায় লাগিয়াছিল কেন—এবং এই ভাগবত মহাশয়ও 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রের বিভীষিকা জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? যদি "বিন্দুমাত্র ক্ষতি" না হয়, তবে এই "প্রতিবাদ" করণার্থে অধ্যাবসায়ই বা কেন? বৃথা চীৎকার করিয়া গলাভাঙ্গা দূরে থাকুক, ঐই মহামহোপাধ্যায়ের লেখা পড়িয়া অনেকেরই চোখ ফুটিতেছে—এই সম্প্রদায়ও যে তাহা না বুঝিয়াছে এমনও মনে হয় না। সে যাহা হউক, ভাগবত মহাশয় মনে রাখিবেন সত্যের জয় চিরকাল—শত মিথ্যা একদিকে আর একটি সত্য একদিকে, সত্যের জয় হইবেই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই সত্যপক্ষ আশ্রয় করিয়া অত্যুক্তি, অসারোক্তি, মিথ্যাবাদ ইত্যাদি নির্ভীক ভাবে দেখাইয়াছেন। প্রতিবাদী পক্ষ যে সব লেখা ছাপাইয়াছেন সেগুলি প্রায়ই অসার বলিয়া প্রতীত হইতেছে—প্রতিবাদ দ্বারা তাঁহারা নিজেরই অনিষ্ট করিতেছেন—আমরা ইহাই দেখিতেছি, এবং "সত্যমেব জয়তি নানৃতম্" ইহাই বুঝিতেছি।

(৮) পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য। রামকৃষ্ণ তাঁহার গুরুকে 'শ্যালা' বলিলেন, তখন তিনি "জগদম্বার ক্রোড়ের সরলশিশু।" আর যখন

* এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একজন সাধু পুরুষ এবং সাধক ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করি। 'বাড়াবাড়ি' করিয়া বরং তাঁহার প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা এ সব গোঁড়ারাই আনিয়াছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম এখন যেন একটু নামিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে”—তখন রামকৃষ্ণ নিজের অবনতি ভাব স্বীকার করিলেন, এটা 'সরলতা' হইল না; এটার বেলায় ভাগবত মহাশয় বলিতেছেন " তর্কচূড়ামণি মহাশয় যদি তাঁহাকে ঐরূপ বুঝিয়া ঐরূপই বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উত্তরই সুসঙ্গত কিনা তাহা বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণ বিচার করুন।" ঐরূপ উত্তর—যাহা, তা হা ''কায়স্থ পত্রিকায়" একজন লেখক খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথাগুলি সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—ধীমান্ পাঠক, পণ্ডিতজীর এই চিত্র হইতেই কি পরমহংসদেবের নিম্নাবতরণা লক্ষ্য হয়?" ... ... জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন বিষয়মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়?" (কায়স্থ-পত্রিকা ফাল্গুন ১৩২৯, ৪১৯ পৃষ্ঠা)। জিজ্ঞাসা করি 'সরল শিশু' কি 'ছলনা' জানে? আমরা মনে করি পরমহংস সরলই ছিলেন—প্রকৃতই জগদম্বাকে মাতৃভাবে সাধন করিয়া তিনি নিজকে শিশুভাবেই গঠন করিতে সতত প্রয়াস করিয়াছিলেন—তাই আমরা বিশ্বাস করি তিনি শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে সরলভাবেই নিজের ঈষদবনত অবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। নচেৎ যিনি গুরুকে শ্যালা বলিয়া শাসাইতে পারিয়াছিলেন—তিনি চূড়ামণি মহাশয়কেও তাদৃশ গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেন।

(৯) পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের প্রতি অবহেলা। ভাগবত মহাশয় অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী চূড়ামণি মহাশয়কেও পরমহংসের "পরীক্ষক"রূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই জানেন যে "গুরুপরীক্ষা" পর্য্যন্ত করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, সেটা দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিষ্যই করিবে। এই "পরীক্ষা" ব্যাপারের প্রকৃত কর্ত্তা শাস্ত্র—শাস্ত্রাদিষ্ট লক্ষণ দেখিয়াই বিচার

করিতে হয়। রামকৃষ্ণ কি তাহারও অতীত? শাস্ত্রে অপ্রবিষ্ট কয়েকজন গিয়া "পরীক্ষা" করিয়া রামকৃষ্ণ যে "অবতার" তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন—সে বিষয়ে ভাগবত মহাশয় নীরব। আর তাঁহারই মতে 'বহুশাস্ত্রদর্শী পরমপণ্ডিত এবং একজন সাধক' তর্কচূড়ামণি মহাশয়—যিনি শ্রদ্ধাসহকারেই পরমহংসের নিকট যাইতেন—তিনি 'পরীক্ষা' করিয়া কিছু বলিবার অনুপযুক্ত!! কলির লক্ষণে আছে "কুলবধূ কুলটাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে"—তাহাই আমাদের মনে হয়। "শত শত মহামহোপাধ্যায়কে" চীৎকার করাইয়াও তিনি বেশ পণ্ডিতমর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন!

(১০) নিজের দোষটি না দেখা, কিন্তু অপরের দোষ দর্শন। ভাগবত মহাশয় রামকৃষ্ণের পক্ষে বলিবার সময় তো বলিলেন "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" ইত্যাদি। পরন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বেলায় তো খুব কবিত্ব ফলাইয়া বলিতে পারিলেন "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।" বেশ কথা। কিন্তু তিনিতো নিজেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উনি একজন "শিক্ষাপরিমার্জ্জিতরুচিব্যক্তি" "তেজস্বী ব্রাহ্মণ" "স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মের অকপট বান্ধবতায় (?) আবার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত" ইত্যাদি। এইরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে তিনি প্রকারান্তরে মহতের প্রতি অপভাষী "পাপভাক্" বলিয়া খ্যাপিত করিলেন? ঐ উপসংহার অংশটা বাদ দিলেও তো তাঁহার বক্তব্যের কোন হানি হইত না।

(১১) অসম্বদ্ধভাষণ। তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে গলদ আছে—কেননা সকল সম্প্রদায়েরই তাহা আছে। এ তো বড় মজার কথা! দোষ আছে—স্বীকার করিবে—কিন্তু কেহ সেই দোষ ঘাটিয়া দেখাইতে গেলে তাহার উপর বিদ্বেষের অভিযোগ আনিবে কেন? অপর সম্প্রদায় (যথা মহাপ্রভুর ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবের দল) মধ্যে যদি

গলদ থাকে এবং তাহাতে সমাজের যদি অনিষ্ট হয়, তাহা সমাজ-হিতৈষী ঘাটিয়া দেখাইতে বাধ্য—বিশেষতঃ এইরূপ সম্প্রদায় যদি নিতান্ত অর্ব্বাচীন হয়। রামকৃষ্ণের রোগ সম্বন্ধে বলেন—কলিকালে কঠোর সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন—যথা দেবাদিদেব শঙ্কর। দেবাদিদেব কি "কলিকালে" কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন ? এবং রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কি তিনি অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ? কলিকালে ত্রৈলিঙ্গস্বামী, বামাক্ষেপা, ভাস্করানন্দ, রামদাস কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি কত শত সাধক মহাপুরুষ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত ছিল। যদি কোনও সাধক কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে একটা গলদ ছিল। তার পর রামকৃষ্ণের পীড়া কি "সাধনার কঠোরতার" ফল ? তাহা হইলে ইহা তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থায়ই দেখা দিত। পারশেষে যখন তিনি (ভক্তদের চক্ষে) সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন এবং (কত ভক্তের নিকটে) 'অবতার'রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন, তখন সাধনার কোনও কঠোরতা তো তাঁহাতে দেখা যায় নাই—তখন এই পীড়া হইল কেন ? তাই, সঙ্গদোষে আচারভ্রষ্ট হওয়াতেই ইহা ঘটিয়াছিল, একথা ভিন্ন আর কি বলা যায় ?

ভাগবত মহাশয় বলেন, পরমহংস রসদদার শম্ভুমল্লিকের 'নাকটেপা'—অপরলতার কথা বলিয়া কোন দোষ করেন নাই ; কেননা তাহা হইলে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ অধিকাংশই ঐরূপ নিন্দুক পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন। "জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ" কি অপরের নিকটে কাহারও কুলক্ষণ বর্ণনা করিয়া উহাকে সাধারণ্যে হেয় প্রতিপন্ন করেন ? শম্ভুমল্লিক যদি রামকৃষ্ণের নিকটে নিজের লক্ষণাদি জানিতে যাইতেন এবং রামকৃষ্ণ যদি শম্ভুমল্লিকের মুখের উপর তাঁহার টেপানাকের

দোষ বর্ণনা করিতেন, তবেই তিনি "জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ" সহিত তুলিত হইতে পারিতেন। অলংবাহুল্যেন।

এখন শিখণ্ডীভূত ভাগবত মহাশয়কে আমরা কতকগুলি কথা বলিতে চাই।

(১) নানাবিধ দর্শনের বিভিন্নমতে যে শ্রুতি ব্যাখ্যা ভেদ আছে তাহা কল্পিত নহে, অধিকারী ভেদে সর্ব্বজ্ঞানাকর শ্রুতি বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ইহাই ব্যাখ্যা ভেদের মূল—দল বান্ধিবার জন্য কল্পনা নহে; বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে সেইরূপ অর্থভেদে ব্যবহার করার উপদেশ প্রদান—শ্রুতির অবমাননা করা এবং বাহ্য প্রতিষ্ঠার হেতুমাত্র। ব্রাহ্মণের লেখাতে এমন ভাব প্রকাশ একান্ত অনুচিত।

(২) রামকৃষ্ণ পরমহংস দ্বারা যে সমাজের কতক উপকার হইয়াছিল, ইহা—কি পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়—কেহই অস্বীকার করেন নাই। বরং ঐ উপকারের কথা চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার চিঠিতে এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুটিয়া সব মাটী করিয়াছে। তিনিও কষ্ট পাইয়া গেলেন, আমরাও ইহাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সমাজের কল্যাণ বিষয়ে আতঙ্কিত হইতেছি। বশিষ্ঠধেনু বিশ্বামিত্র সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ঐ ধেনুর পুচ্ছদেশ হইতে যবন সেনার আবির্ভাব হয়; ঐ সেনা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল পরাজিত করিয়া ধেনুর রক্ষাবিধান করে। পরন্তু ধেনু কর্ত্তৃক সৃষ্ট যবন বংশ দ্বারাই ধেনুকুলের ঘোরতর অনিষ্টসাধন হইয়াছে। পরমহংস দ্বারা যেটুকু উপকার হইয়াছিল, তৎসম্প্রদায়ের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিতেছে।

(৩) পরমহংসদেব 'দল' হউক, ইহা ইচ্ছা করিতেন না। তিনি নাকি বলিতেন 'এঁদো পুকুরেই দল বাঁধে' ইত্যাদি। তারপর

ডিস্পেন্সারী হাস্পাতালেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন তাহারই নামে 'দল' বা সম্প্রদায় (মিশন, সঙ্ঘ ইত্যাদি) হইতেছে এবং উহারা ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল ইত্যাদিই করিতেছে। তবে এরূপটা করার জন্য রামকৃষ্ণই মূলতঃ দায়ী; শেষাবস্থায় তিনি—ভরত যেমন হরিণ শিশুর মোহে পড়িয়াছিলেন—কতকগুলি লোকের মায়াজালে জড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে কি হইল তাহা এই প্রবন্ধে বলা পুনরুক্তি মাত্র।

(৪) পরমহংসকে (বা বিবেকানন্দকে) সমগ্র দেশের লোক জগদ্বরেণ্যই মনে করুক বা নাই করুক, তাহাতে আমরা ভুলিব না—শাস্ত্রের ও সদাচারের দিক্ দিয়া তাঁহাদের চাল-চরিত্র দেখিয়া তারপর তাঁহাদের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিব। রামমোহন রায় এবং কেশব-চন্দ্র সেন তাঁহারাও সমগ্র দেশের লোকের নিকট ঐরূপ "বরেণ্য" ছিলেন—তাই বলিয়া তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা যদি সমাজের অনিষ্ট হইয়া থাকে—তজ্জন্য সমাজহিতৈষীর নিকট তাঁহারা শত্রুরূপেই বিবেচিত হইবেন। ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা 'সমাজ' বড়—ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে; অতএব সর্ব্বাগ্রেই সমাজ, স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ইত্যাদি দেখিতে হইবে—তারপর ব্যক্তিবিশেষকে বিচার করিতে হইবে। সমাজসমষ্টির হিতাহিত কাহার দ্বারা কিরূপ হইয়াছে, তাহাই মাপকাঠি করিব। এই হিতাহিত বোধ কয়জনের আছে? বিশেষতঃ আজকাল শাস্ত্রবিশ্বাসী লোক বড়ই বিরল, আবার শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোক মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। শাস্ত্রানুশাসিত সমাজের প্রকৃতপক্ষে কি হিত কি অহিত শাস্ত্রবিশ্বাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই বলিতে পারেন। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট রামকৃষ্ণ বা তদীয় সম্প্রদায় কিরূপ সমাদৃত, তাহাই দেখিতে হইবে। শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ও জ্ঞানবর্জ্জিত শতসহস্র পুত্তলিকা সদৃশ জনতার প্রশংসাবাদে বিশেষ কিছু আসে যায় না—কোনও স্থায়ী ফলও হয় না। তবে আজকাল এইরূপ জনতা সাহায্যেই অনেকে বেশ পসার করিয়া লইতেছে। ঈদৃশ জনতা

হাতে রাখিবার জন্ত ইহারা তদনুকূল মত প্রচার করিতেছে। যথেচ্ছ আহার বিহার কর—সদাচার বা শাস্ত্র কিছুই নহে, এসব ব্রাহ্মণের কারসাজি—কিন্তু "ঠাকুর" যাহা বলিয়াছেন তাহাই বেদ, তাহাই বেদান্ত; ঠাকুর বলিয়াছেন "আমাকে চিন্তা করিলেই সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে; সাধন ভজনের কোন দরকার নাই;" ইত্যাকার বিবিধ উপদেশ প্রচার হইতেছে। রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এখন এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে!

(৫) গন্ধতৈল, প্যাটেন্ট ঔষধ ইত্যাদি যেরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে খুব চলে—এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ নানাভাবে বিজ্ঞাপনজারী করিয়া প্রসারলাভ করিয়াছে; মিশন, সেবাশ্রম ইত্যাদি ঐসকল বিজ্ঞাপনের এজেন্সী স্বরূপ। ছবি ছাপাইয়া পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তো যথাসাধ্য প্রচার হইতেছে, এছাড়া 'মিল্' হইতে স্কুলের ছেলেদের খাতায় পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের নামের ছাপ পড়িয়াছে। তাহাতে কয় দিন বেশ চলিবে, তৎপরে ক্রমশঃ পসার কমিয়া আসিবে। লোকে এসব চতুরতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের দেখাদেখি আরো 'অবতার'দের সম্প্রদায়ও দেখা দিতেছে, সেগুলিও এইরূপই।

(৬) রামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল 'সাধন ভজন কর' 'মাকে ডাক' ইত্যাদি; আর তৎসম্প্রদায় এখন সমাজবিরুদ্ধ আচরণ শিখাইতেছে। নীতিবিরুদ্ধ কথাও প্রচারিত হইয়াছে, যেমন বিবেকানন্দ বলিতেন "না হয় একটা বড়দরের চুরি ডাকাতি কর—বুদ্ধি খুলুক"। সংসারানভিজ্ঞ ভাবপ্রবণচিত্ত যুবকগণ অনেকে এসব উদ্ভট উপদেশও সাগ্রহে শিখিয়া সমাজে অশান্তি আনয়ন করিতেছে; নিজেরাও শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে।

ভাগবত মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ সন্তান; আশা করি তিনি এসব বুঝিয়া দেখিবেন,—শিখণ্ডী হইয়া ক্লৈব্য প্রকটন না করিয়া, "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি" এই ভগবদ্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাঁহারা নির্ভীক ভাবে সমাজ সেবার্থ চেষ্টা প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের অনুকরণে সমাজ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হইবেন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ঃ

গ। "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" প্রবন্ধের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর ঃ

(শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী)

[সম্পাদকীয় মন্তব্য—১৮৪৪ শকাব্দের মাঘসংখ্যক 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ লিখিত "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য) কেহ ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু লিখিলে, তাঁহার উচিত যে সর্ব্বাদৌ "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রিকায় তাহা প্রেরণ করেন। * কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা এই ছদ্মনামা জনৈক কায়স্থ (?) তাহা করেন নাই—ইনি "ব্রাহ্মণসমাজ ও পদ্মনাথ" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত উপরি উক্ত প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন ইত্যাদি আছেই—এছাড়া, তিনি কায়স্থ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই তদীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একথাও লেখা হইয়াছে। "কায়স্থ পত্রিকায়" লিখিত প্রবন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপরে সাধারণ ভাবে "কায়স্থ বিদ্বেষ" অযথা আরোপিত হইয়াছে—ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কামরূপ কায়স্থ সমাজের অগ্রণী স্বরূপ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন

---

* প্রতিবাদ "ব্রাহ্মণসমাজে" পাঠাইলে যে উহা প্রকাশিত হইত—তাহার প্রমাণ গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যক পত্রিকাতেই আছে—তাহাতে শ্রীযুক্ত ভাগবত ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রতিবাদ (তেমন সারগর্ভ না হইলেও) প্রকাশিত হইয়াছে।

নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন—এই প্রবন্ধটির তিনি নাম দিয়াছিলেন—"প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।" প্রথমতঃ তিনি প্রবন্ধে স্বীয় নাম স্বাক্ষর না করিয়া "জনৈক কামরূপ বাসী কায়স্থ" এইরূপ পরিচয় মাত্র দিয়া কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে প্রবন্ধ পাঠান—কিন্তু সম্পাদক নিকটে লিখিত পত্রে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেন। সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রবন্ধটি ফেরত দিয়া লিখেন যে নাম না দিলে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে না (অথচ যে প্রবন্ধের ইহা উত্তর সেই প্রবন্ধে প্রকৃত নাম নাই—একটা ছদ্ম নাম আছে)। তারপর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় ইহা প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে প্রসন্ন নারায়ণ বাবুর বিশেষ পরিচিত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের শিরোমণি স্বরূপ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এই প্রবন্ধের কথা শুনিয়া এবং ইহা ফেরত গিয়াছে জানিয়া এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ইহা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহার প্রকাশার্থ অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে দ্বিতীয়বারের ঐ নাম স্বাক্ষর-যুক্ত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর নিকটই প্রেরিত হয়। সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু জানাইয়া দিয়াছেন, "প্রতিবাদ প্রবন্ধটি (অর্থাৎ প্রসন্ন নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ) আমার অনুরোধে পত্রিকা পরিচালনসমিতিতে দেওয়া হয়, কিন্তু নানাকারণে প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইবে না একারণ ফেরত পাঠাইতেছি"। *

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু জানাইয়াছেন যে "বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি পত্রিকাসম্পাদক বা পত্রিকা পরিচালনসমিতির অজ্ঞাতসারে পত্রিকায় বাহির হইয়াছে তজ্জন্য সমিতি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষে যে উক্তি করা হইল, তাহা পত্রিকাসম্পাদকের অজ্ঞাতসারে কিরূপে হইল, আমরা বুঝিলাম না। অপিচ, প্রবন্ধটি ফেরত পাঠান হইয়াছে এরূপ লেখা সত্ত্বেও নাকি উহা পাওয়া যায় নাই; ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রবন্ধের একটা নকল ছিল, তাই ইহা প্রকাশিত হইতে পারিল।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তপ্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকায় প্রকাশার্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ লেখকের প্রবন্ধই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধটির সঙ্গে "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকার যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা 'ব্রাহ্মণ-সমাজে' প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিশেষের প্রতিবাদের উত্তর—এবং ইহা প্রকাশ না করিয়া কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক তথা পরিচালন সমিতি ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রবন্ধ লেখক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর যে অবিচার করিয়াছেন, আমরা ইহা প্রকাশ না করিলে সেই অবিচারের অংশভাজন হইব বলিয়াই মনে করি। তাই ইহা পত্রিকাস্থ করা হইল। কায়স্থ-সমাজপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ (অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রবন্ধটি যাহার উত্তর) এই সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করা অনাবশ্যক মনে করিলাম, কেননা উত্তরের মধ্যেই ঐ প্রবন্ধের কথাগুলি প্রায়শঃ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তথাপি যাঁহারা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চান তাঁহারা কায়স্থ পত্রিকা একবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩২৯) দেখিতে পারেন।]

বিগত (১৩২৯ সালের) মাঘমাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; ফাল্গুন মাসের "কায়স্থপত্রিকায়" শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন।* বর্ত্তমান প্রবন্ধ বর্ম্মামহাশয়ের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

কেবল "ব্রাহ্মণ-সমাজে"র প্রবন্ধ নহে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকা-

* প্রবন্ধ যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রতিবাদও সেই পত্রিকায়ই প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল; বর্ম্মামহাশয় কিজন্য তাহা করেন নাই বুঝিতে পারিলাম না।

নন্দ সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রবন্ধেরই খবর আমি রাখি ; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বারম্বার বলিয়াছেন তিনি পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ; এবং তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ (আসামে বিবেকানন্দ) 'সাহিত্যে' পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন তিনি স্বামীজির ভক্ত নহেন, তথাপি ৺সমাজপতি মহাশয় প্রবন্ধ পাঠাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন "আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা।" (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ফুটনোট দেখুন)। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন "অতি বড়লোক" তাহা এবং স্বামীজির গুণাবলীর কথাও আমরা তদীয় প্রবন্ধাবলীতে দেখিতেছি।* অতএব নেহাৎ অনাহূতভাবে এবং বিদ্বেষভাব প্রণোদিত হইয়াই যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন একথা কিরূপে বলা যায়? পরমহংসদেবের সম্বন্ধে তিনি কুত্রাপি কোনও তীব্র মন্তব্যও করেন নাই। তবে তৎসম্বন্ধীয় তথ্য নির্ণয়ার্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চিঠি পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন—বরং চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে বিতর্কও করিয়াছেন (প্রথম পরিশিষ্ট—ক দেখুন)। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই মধ্যে মধ্যে তীব্র মন্তব্য আছে—সে বিষয়ে উপসংহারে তিনিই বলিয়াছেন "বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন—আমরা যদি আবেগবশতঃ তাঁহার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটু বলিয়া থাকি, আশা করি তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে।" (তৃতীয় প্রবন্ধ—শেষ ভাগ)

* "আসামে বিবেকানন্দ" এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) দেখুন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় ব্যাপারটা বেশ 'ঘোরালো' করিবার নিমিত্তই বোধ হয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর কায়স্থ বিদ্বেষের অভিযোগ করিয়াছেন। এই অন্যায় অভিযোগই প্রধানতঃ এই দীন কায়স্থকে বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে তিনি কায়স্থের উপনয়ন সংস্কারে, ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপনে, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই, একথা বলাতেই যদি 'কায়স্থ' জাতির উপর তাঁহার বিদ্বেষ সূচিত হইয়া থাকে তবে এই অধমকেও স্বজাতি বিদ্বেষে অভিযুক্ত করিতে পারেন। আমাদের এই অঞ্চলে অন্ততঃ, সদাচার কায়স্থ কেহ বেদবিহিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় সাজেন নাই। শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি যে যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করেন না, সমাজে একাকারের পক্ষপাতী, আচার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, ব্রাহ্মণের প্রতি বিরাগবান্ বঙ্গদেশের এইরূপ কায়স্থও নাকি পৈতা নিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের বড়াই করিয়া থাকেন। বৈদ্যের উপর টেক্কা মারিবার জন্যই বোধ হয় এই আন্দোলনের সৃষ্টি। অশৌচকালের সংক্ষেপ ভিন্ন ইহা দ্বারা কোনও লাভ * হইয়াছে কিনা জানিনা। কায়স্থেতর জাতির নিকট এই নিমিত্তে কায়স্থের সম্মান অণুমাত্রও বাড়িয়াছে বলিয়াও তো বোধ হয় না। এই অঞ্চলের কোচ কলিতাগণও এভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছে—কিন্তু উহাদের সামাজিক সম্মান পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

সে যাহা হউক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে কায়স্থ বিদ্বেষ কিছুমাত্রও নাই, কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহার সমর্থন করিতেছি—

* ইহাও কি লাভ? বরং আমি মনে করি অনেককাল বাধ্য হইয়া সাত্ত্বিক (নিরামিষ) আহার ব্যবস্থা কল্যাণ জনক, অথচ আমাদের কর্ত্তব্য তান্ত্রিক সন্ধ্যাদির নিষেধও নাই। বলা আবশ্যক যে কামরূপের কায়স্থগণ তাঁহাদের কায়স্থ সূচক (মালাকারে) সূত্র ধারণ করেন কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বসূচক ১২ দিন অশৌচ লয়েন না, ৩০ দিনই মানেন।

(১) ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণকারী কায়স্থকুল প্রধান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একাধিকবার গৌহাটিতে আসিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ সভা, বঙ্গীয় ও আসামীয় কায়স্থ-সমাজ কর্তৃক ভোজের ব্যবস্থা ইত্যাদি তিনিই করাইয়াছিলেন।

(২) বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস পুস্তকের ভূমিকায়, ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে কায়স্থ ৺চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দের নাম সমাজের কল্যাণসাধক মহাত্মগণের তালিকায় সাদরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) "কায়স্থাবতার শঙ্করদেব" নামক যে পুস্তকখানি বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে উহার "বিজ্ঞাপিকা" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্তৃক লিখিত এবং পুস্তক প্রকাশে তাঁহার কতটুকু যে যত্নচেষ্টা ছিল তাহা ঐ বিজ্ঞাপিকা পাঠেই প্রতীত হইবে।

(৪) অত্রত্য কায়স্থপ্রধান অনেকেই, যথা—রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী প্রভৃতি বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের সুহৃদ্, এবং পরিচিত কায়স্থমাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

ফলতঃ কোন জাতি বিদ্বেষ নিয়া যে তিনি ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি কি জন্য এ ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা "সাহিত্যে" প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষের উপসংহারেই বলিয়াছেন—"দুর্ভাগ্যবশতঃ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও সমাজের পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার লোক দিন দিনই বিরল হইয়া পড়িতেছেন—অযোগ্য হইলেও এসময় স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ও সমাজের অনুকূলে বিশেষতঃ

বিপক্ষের প্রতিকূলে দু'চারি কথা না বলিয়া উদাসীন থাকা কাপুরুষতা মনে করি। ইহাতে যদি প্রতিপক্ষের কটূক্তির আঘাত সহ্য করিতে হয়, করিতে প্রস্তুত আছি; কেবল বলিব ভাই strike but bear, মারো কিন্তু শুন।" (প্রথম পরিশিষ্ট খ—শেষাংশ দেখুন) স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন "অন্যায় অসত্য দেখ্‌লে চুপ করিয়া থাকতে নাই।" (কথামৃত তৃতীয় ভাগ ৯৩ পৃষ্ঠা)

তাই কেবল এই সকল প্রবন্ধ নহে—পরন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের অবগতির জন্য লিখিতে হইল, যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে স্যার পি, সি, রায় মহাশয়ের বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার প্রবন্ধেরও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে গেইট সাহেবকৃত "আসাম ইতিহাসের"ও তীব্র সমালোচনা করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহাতে জাতি বিচার করেন নাই—ব্রাহ্মণ ৺রামমোহন রায়, ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়—ইঁহাদেরও শাস্ত্র সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় প্রতিকূল মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে চাটু ও অত্যুক্তি-বাদের প্রতিবাদ তিনি যেরূপ সাহসের সহিত করিয়াছেন, তেমন বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। আশা করি ইহাতেই চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রান্তিনিরাস হইবে। কায়স্থ-বিদ্বেষ বশতঃ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহা যদি একটা যুক্তি হয় তবে চন্দ্রদত্ত বাবুর প্রতিপক্ষও বলিবেন, স্বজাতি প্রেম প্রণোদিত হইয়াই চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় কেবল যে কায়স্থ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গলদ দেখেন নাই এমন নহে, তাঁহাকে বাড়াইবার জন্য নিম্নোক্তরূপ অতিশয়োক্তি * তদীয় প্রবন্ধে স্থান

* ব্রাহ্মেরা রাজা রামমোহনের সম্বন্ধে এবং নব বিধানীরা ৺কেশবচন্দ্র

পাইয়াছে—"বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ;" "স্যাসি (?) শিরোমণি বিবেকানন্দের মেঘমন্দ্র বাণী জগৎ আলোড়িত করিয়াছে; চক্ষুষ্মান্ চাহিয়া দেখ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি। চাহিয়া দেখ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী কি ভাবে উড়াইতেছেন।" "সমবেত ভাবে নাম দিয়া বা নাম-না দিয়া যেখানেই সেবাকার্য্য আরম্ভ হউক সেই খানেই বিশ্বপ্রেমিক, ভারত প্রেমিক, বাঙ্গালীকুল শিরোমণি বিবেকানন্দের শ্রীকর চিহ্ন বর্ত্তমান।" অথচ এ সকল উক্তিতে প্রমাণ প্রয়োগের কোন বালাই নাই! *

পরমহংস অবশ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন; তবে তাঁহাকে অবতার সাজাইবারও এরূপ মতলব হইতে পারে যে তাঁহার মুখ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসাবাদ (যথা, ও যদি অখাদ্য খায় তবে দোষ হইবে না ইত্যাদি প্রচার) করা হইয়াছে। নচেৎ অনাচারী স্বামীজির প্রতি হিন্দুসাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারিত।

স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ জাতির—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির—গৌরবের জিনিস, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার চিঠি পত্র বক্তৃতাদিতে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর বিষম আঘাত পড়িয়াছে, ইহাতেও সংশয় নাই। তিনি খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না—তজ্জন্য বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে বলিতেন "হাঁড়িধর্ম্ম"; স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারকে বলিতেন

সেন মহাশয়ের সম্বন্ধেও এইরূপ অত্যুক্তি করিয়া থাকেন। ফলতঃ নূতন সম্প্রদায়ের গোঁড়ারা প্রবর্ত্তকদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ এতাদৃশ অন্ধভক্তি প্রকটিত করিয়াই থাকেন।

* চন্দ্রদত্ত বাবু লিখিয়াছেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "জাতিকলহ" "জাতি-বিদ্বেষ" দ্বারা প্রণোদিত হইয়া "মহাপুরুষ নিন্দায়" প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ—কায়স্থ বিবেকানন্দ তাঁহার "জাতি" হইলেন কিরূপে? চন্দ্রদত্ত বাবু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে অগ্নিহোত্রী বলিয়াছেন—এই উদ্ভট সংবাদটা তিনি কোথায় পাইলেন?

"ছুৎমার্গ"; ব্রাহ্মণদিগকে—শাস্ত্রকার দিগকে—বলিতেন "দুষ্টপুরুত"। এ সকল হলাহল স্বামীজির সম্প্রদায়স্থ লোকেরা পুস্তকাদিতে সমাজমধ্যে প্রচার করিতেছেন—স্বধর্ম্মে অনাভিজ্ঞ সরল প্রকৃতির নব্যযুবক অনেকে এ সব অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে সদাচার বিদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। জনসেবার ব্যপদেশে অনেক যুবক পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া মঠে বা আশ্রমে যোগ দিতেছে, ইহাতেও সমাজের নানাদিক্ দিয়া ক্ষতি দেখা যাইতেছে। তারপর স্বামীজির অনুকরণে আজকাল অনেক অমুকানন্দ তমুকানন্দ দেখা দিতেছেন, তাঁহাদের ত্যাগের মধ্যে এক বিবাহ না করাটাই দেখিতে পাই—সেটা করিলে নানা ঝঞ্ঝাটেও যে পড়িতে হয়! কিন্তু তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া চলা বসা পোষাক পত্র (একটা গেরুয়ার আবরণ ছাড়া) বিলাসিতারই পরিচায়ক; ইহাতে সন্ন্যাসের আদর্শ খর্ব্ব হইয়াছে। এই সকল কারণে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধাবলীর সহিত আমাদের ঐকমত্য খ্যাপন করিতেছি এবং আশা করি যে এগুলি দ্বারা সমাজের অনেকের চোখ ফুটিবে—এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য * জানিয়া অনেকেই সাবধান হইবেন। আমরা জানি, এই সকল প্রবন্ধের জন্য তিনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবিশ্বাসী বিষয়ী ব্যক্তিগণ হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন—এমন কি এসকল প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্যও অনুরোধ আসিতেছে। ইতোমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী

---

* একটি অভিনব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যোদ্ঘাটন করিতে হইলেই ঐ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের ব্যক্তিগত কথা—তাঁহাদের কার্য্য বাক্য ইত্যাদি—আলোচনার বিষয় হইয়াপড়া অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে যদি গলদ প্রকটিত হইয়া পড়ে সে জন্য আলোচক দায়ী নহেন—তবে তিনি সর্ব্বদাই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় মন্তব্য সমর্থন করিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

হিন্দী ভাষায় (জনৈক হিন্দুস্থানী লেখক কর্ত্তৃক) অনুবাদিত হইয়া প্রসিদ্ধ হিন্দীমাসিক "মর্য্যাদা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব চন্দ্রদত্ত বাবু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। এবং তাঁহাকে "পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা আবশ্যক" এই উপদেশ প্রদান করাটা নিতান্তই হাস্যকর। শুনিয়াছি পুরাণে নাকি আছে—কলিতে চোর সাধুকে, দুর্জ্জন সজ্জনকে, স্বৈরিণী পতিব্রতাকে শাসাইবে; তাই এরূপ উপদেশ সম্ভাবিত হইল * !!

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে তো উপদেশ দেওয়া হইল; কিন্তু চন্দ্রদত্ত বাবু জানেন কি, নূতন সম্প্রদায় যাঁহারা প্রবর্ত্তনকরেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় কি একটা গল্প করিতেন? গল্পটা সংক্ষেপে এই। নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মৃত্যুর পরে যমপুরী গেলে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বিচার সভায় দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিলেন। তারপর ঐ সম্প্রদায়ের কেহ যমালয়ে আসিলে প্রশ্ন হইল "আমি তোমাকে যাদের ঘরে জন্ম দিয়াছিলাম তুমি তাদের কুলক্রমাগত সাধনপথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে কেন গিয়াছিলে?" ঐ ব্যক্তি সেই স্থলে দণ্ডায়মান নবধর্ম্মগুরুকে দেখাইয়া উত্তর করিল "হুজুর উঁহার উপদেশে আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।" তখন হুকুম হইল—একে লাগাও ৫০ বেত—তবে অর্দ্ধাংশ (২৫ ঘা) প্রবর্ত্তকের প্রাপ্য।" অবশ্য এটা গল্প মাত্র; তবে ইহার ভিতর যে নীতিকথা আছে আশা করি বর্ম্মা মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া

* বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি যে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির অধিবেশন বিশেষে তদীয় বন্ধু জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ তো ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন, তবে সভাপতিত্বের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ধরা হয় কেন? নিষেধ না করাটা বরং তাঁহার পক্ষে বাস্তবোচিত কার্য্য হইত না।

"দেখিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তো পিতৃপিতামহের পথেই যথাশক্তি চলিতেছেন—সুতরাং তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য তেমন ব্যগ্র না হইলেও ক্ষতি হইবে না।

নিতান্ত অবান্তর ভাবে চন্দ্রদত্ত বাবু পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় প্রবন্ধে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, পরমহংসদেব শেষাবস্থায় কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ চিঠি যে কেবল 'সারথি' পত্রে ছাপা হইয়াছিল, এমন নহে, ইহা ১৩২৭ সালের সাহিত্যপত্রের পৌষ-মাঘ যুগ্ম সংখ্যায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। (এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।) পরমহংসদেব স্বয়ংই নাকি তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে একথা বলিয়াছিলেন। এই চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রদত্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ধীমান্ পাঠক পণ্ডিতজীর এই চিত্র হইতে পরম-হংসদেবের নিম্নাবতরণ লক্ষ্য হয়? জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন বিষয়-মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়?" অবশ্য এই অধম নিজকে "ধীমান্" মনে করে না; তথাপি চূড়ামণি মহাশয়ের বর্ণনার আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়িয়া তো বুঝা যায় ইহাতে ছলনার নামগন্ধও নাই—বেশ সরলভাবেই পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ভাবিয়া তৎসমীপে নিজের আধ্যাত্মিক অবতরণের অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। পরমহংসদেব তো বালকের ন্যায় সরল ছিলেন—তিনি কাহাকেও কস্মিন্‌কালে ছলনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তিনি তো তাঁহার পীড়ার সম্বন্ধে বলিতেন "অবতারের কি ক্যান্‌সার হয় গা?" অথচ গোঁড়া ভক্তেরা বলিতেন—"তিনি ডাক্তারের অভিমান বাড়াইবার জন্য পীড়া করিয়া বসিয়া আছেন!" প্রকৃত সরল ভাবকে এরূপ জটিল করা কি উচিত? সে যাহা হউক ছলনার কোনও কারণ এস্থলে দেখা যায় না। চূড়ামণি মহাশয় অতি বিনীত ভাবে কথাটি উপস্থাপিত

করিয়াছিলেন—তাঁহার জিজ্ঞাসায় কোনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় নাই! চন্দ্রদত্ত বাবুই তো বলিতেছেন চূড়ামণি মহাশয় "পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ" করিয়াছিলেন। এই কি "প্রেম-ভক্তিহীনের" লক্ষণ? তিনি কদাপি পরমহংসদেবের নিকটে "জ্ঞানা-ভিমান" ও দেখান নাই; চন্দ্রদত্ত বাবুই তো বলিয়াছেন, চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের আলাপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন "যাহা কিছু শুনিতেছি ইহা বেদবাক্য তুল্য—এমন কথা এ জীবনে শুনি নাই।" * এরূপ উক্তি কি "জ্ঞানাভিমান" দ্যোতক? পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে 'বিষয় মোহিত' বলিয়াও মনে করিতেন না, কেননা পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে জ্ঞানের চিহ্ন দেখিতেন (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১১৯পৃঃ দেখুন)—জ্ঞানী কখনও বিষয়মোহিত হইতেই পারেন না। অতএব ছলনার কারণ গুলির কোনওটি টিকিতেছে না। বিশেষতঃ পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে বড়ই আপনার মনে করিতেন। কথামৃত (তৃতীয়ভাগ ৯৭ পৃঃ) আছে, তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বলিতেছেন "আবার আস্‌বেন। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে আহ্লাদ করে—গরু আপনার জনকে দেখ্‌লে গা চাটে ইত্যাদি।" এ অবস্থায় ছলনার ভাব আসিতে পারে কি?

চন্দ্রদত্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর যিনি বাগবাজারস্থ বসু বলরামের মন্দিরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ কথা শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন

* চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা এবং এই উক্তি (এমন কথা এ জীবনে শুনি নাই) যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না; এ বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। তবে চূড়ামণি মহাশয় যে "অভিমান শূন্য" ও প্রণামাদি করিয়া "প্রেমাশ্রু বিসর্জন" করিতেন—একথা "কথামৃতেও" আছে (৪র্থ ভাগ ১১৯ পৃঃ ১২১ পৃঃ দেখুন)

'যাহা কিছু শুনিতেছি, ইহা বেদবাক্য তুল্য। এমন কথা এজীবনে শুনি নাই?' ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর যিনি মহাভাব সমাধিস্থ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন?" ইহার পর প্রমাণার্থ বলিতেছেন "এই দৃশ্য দ্রষ্টা ও শ্রোতা এখনও বর্ত্তমান।" তাঁহার জিজ্ঞাস্য—তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের কাছে পৌছা-ইয়াছেন কিনা জানি না—এবং তিনিই বা কি উত্তর দিবেন, বলিতে পারি না। তবে বসু বলরামের মন্দিরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আর এক প্রত্যক্ষ "দ্রষ্টা ও শ্রোতা" (সেই দিনই নোট্ করিয়া রাখিয়া) পুস্তকমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কথামৃত ৪র্থ ভাগ পঞ্চদশ খণ্ডে ঐদিনের ঘটনা লিখিত হইয়াছে—তাহাতে ঐরূপ কথার নামগন্ধও নাই। * অন্যত্র কোনও স্থলেও এরূপ কথা (অন্ততঃ কথামৃতে) আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু হঠাৎ এই 'জিজ্ঞাসা'টা কেন করা হইল তাঁহার কারণ ভাল বোঝা গেল না। চূড়ামণি মহাশয় তো পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ই ছিলেন। তবে অত্যুক্তিবাদ বা গড়াইয়া পড়া না শুনিলে বা না দেখিলে কি চন্দ্রদত্ত বাবুর আশ মিটেনা?

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় (পূর্ব্বে উল্লিখিত) অত্যুক্তি গুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। চন্দ্রদত্ত বাবুর লেখার এরূপ প্রতীতি হয় যে মহাত্মা সাক্ষী বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ যাহা করিতেছেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দের 'মেঘমন্দ্র বাণীর'

* 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথা (অর্থাৎ পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার কর, চাপরাশ আছে?) প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি ঈদৃশ সাক্ষীর কথা বলিয়াছিলেন—কিন্তু যখন সাক্ষীর পরিচয় চাওয়া হইল তখন তিনি নীরব রহিলেন। (প্রথম পরিশিষ্ট—ক দেখুন।)

জগদালোড়নের ফল। কিন্তু মহাত্মার অথবা শ্রদ্ধানন্দের সাধন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র স্বামীজির মেঘমন্দ্রবাণী দ্বারা কি ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি—এবং চন্দ্রদত্ত বাবুও বলেন নাই। তবে মহাত্মা যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, তিনি যে সব নীতির প্রচার করিতেছেন, স্বামীজি বা তৎসম্প্রদায় তাহা করিয়াছেন কি? মহাত্মার উপদেশাবলীর এক আধটা বিবেকানন্দের বাণীর সদৃশ হইতে পারে, * তেমন সাদৃশ্য চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশাবলির সঙ্গেও মহাত্মার কথাগুলির আছে—বরং অধিকতরই আছে। মহাত্মা কোনও 'আনন্দ' সাজিয়া গেরুয়া পরেন নাই—অথচ আহারে পোষাকে, চলায় ফিরায় সংযম সাধনায়, স্বামীজির বা তদনুবর্ত্তী 'আনন্দ' গণের সহিত তাঁহার কত প্রভেদ! তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে ভাবে শুদ্ধি চালাইতেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ বা তৎসম্প্রদায় সেরূপ কি করিয়াছেন? দুই এক জন বিলাতী বা মার্কিনী সাহেব মেমকে গেরুয়া পিন্ধাইয়াছেন বটে—কিন্তু স্বামীজির বহুপূর্ব্বে থিয়সফি দলে ঢুকিয়া অনেক সাহেব মেম হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি সংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন; এমন কি মুক্তি ফৌজের দলেও গৈরিকবস্ত্র এবং হিন্দুনাম গ্রহণ পর্য্যন্ত হইয়াছে শুনিয়াছি। বিবেকানন্দের সম্প্রদায় এদেশের কয়জন মোসলমানকে হিন্দু করিয়াছেন? এমনকি, বৈষ্ণব গোস্বামীরা কত পার্ব্বত্য জাতিকে হিন্দু বানাইয়াছেন—সে দিকেও তো এই সম্প্রদায় কিছু করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। তারপর 'সমবেত ভাবে নাম দিয়া বা নাম না দিয়া যেখানেই সেবাকার্য্য আরব্ধ হউক, সেইখানেই বিবেকানন্দের শ্রীকর-চিহ্ন বর্ত্তমান'—ইহার অর্থ কি এই নয় যে স্বামীজি কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন সংস্থাপনের পূর্ব্বে এদেশে কুত্রাপি সমবেত ভাবে কোনও সেবাকার্য্য ছিল না? যাঁদের

* মহাত্মার "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন" ও স্বামীজির 'ছুৎমার্গ' পরিহার ঠিক একার্থ বাচক কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে।

কাছ হইতে মিশন শব্দটি ধার করা—আমি এস্থলে তাঁদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান্ মিশনারীগণের) কথা বলিব না—তাঁহারা দুর্ভিক্ষাদিতে ও পীড়ার সময়ে এদেশীয় নর নারীর সেবা করিয়া উপদেশে লোকদের খ্রীষ্টান করিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মগণের কথাও বলিব না—তাঁহারাও খ্রীষ্টিয়ানদের অনুকরণে 'মিশন' (স্বামীজির বহু পূর্ব্বেই) করিয়াছেন। আমি আমাদের সমাজের কথাই বলিব। হিন্দুদের সমাজ বন্ধন যেরূপ তাহাতে পরস্পর সহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠে—জ্ঞাতি মরিলে সকলে মিলিয়া বহন দহন করে, অশৌচ মানে—শ্রাদ্ধে সকলে সাহায্য করিয়া ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। ব্যষ্টিভাবে দরিদ্র সেবার জন্য মুষ্টিভিক্ষা, শ্রাদ্ধাদিতে কাঙ্গালী ভোজন ইত্যাদিতো রহিয়াছেই। সমষ্টিভাবেও গ্রাম দেশে যুবকদের এক-একটা দল থাকে *—উহারা বিপদ্ আপদে লোকের সাহায্য করে—ডাকাত পড়িলে বা আগুন লাগিলে উহারাই অগ্রসর হয়—আবার উহারাই বার-ইয়ারি পূজা করে, বরযাত্রীর দল পুষ্ট করে; ইদানীং স্কুল ডিস্পেনসারীর জন্য সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সময়ে চাঁদাও উঠায়। আর পাশ্চাত্য অনুকরণেও "শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি" প্রভৃতি দু'একটা অনুষ্ঠান † স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বেও হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা। কংগ্রেসে ভলাণ্টিয়ারের দল গঠিত হইত—এবং আমার বোধ হয় ১৮৯১ সালে যে "অর্দ্ধোদয়যোগ" হয় তাহাতে কলিকাতায় তাদৃশ ভলাণ্টিয়ারদল গঠিত হইয়া সমাজ সেবায়ও নিযুক্ত হইয়াছিল। অতএব রামকৃষ্ণ মিশন খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদের অনুকরণে গঠিত হইলেও হিন্দুসমাজের পক্ষেও একেবারে অভিনব জিনিস নহে। সন্ন্যাসীর দল তো চিরকালই পরার্থপরায়ণ—এমনকি বিশে ডাকাতের

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "যুগান্তর" উপন্যাসে বঙ্গদেশের একটি পাড়াগাঁয়ের চিত্র আছে—তাহাতে 'হাঁসের দল' নামক এক যুবকসঙ্ঘের বর্ণনা আছে। কল্পিত হইলেও বাস্তবের উপর ইহার ভিত্তি বলিয়াই মনে হয়।

† সেদিন সংবাদ পত্রে "কলিকাতা অনাথ আশ্রমের ৩১ শ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ পড়া গেল। তাহা হইলে, ১৮৯২ অব্দে—বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে—ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে।

দলও নাকি দরিদ্রের সেবা করিত, যদিও ধনীর ঘাড় ভাঙিত। বরং স্বামীজির প্রবর্ত্তিত মঠ * সেবাসমিতি প্রভৃতিতে (খৃষ্টানদের ন্যায়) নিজেদের সম্প্রদায় প্রচারার্থ পুথি ছবি ইত্যাদির বিক্রয়, স্বামীজিদের কেহ আসিলে অভিনন্দনার্থ সভা করা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা করা, রামকৃষ্ণের পূজার্থ মন্দির করা ইত্যাদির প্রচেষ্টা দেখা যায়—তাহাতে জনসেবা "নিঃস্বার্থ" ভাবে হইতেছে বলা যায় না।

রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা উপকার অবশ্যই হয়—কোন্ মিশন দ্বারাই বা কিছুটা না হয়? তবে যখন দেখিতে পাই, যে নব্যযুবকগণ পিতামাতার সেবা ছাড়িয়া মিশনে যোগ দিতেছে ও উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ না হইয়া ভিক্ষুকের দল বাড়াইতেছে, † আর (বঙ্গদেশের আথড়ার মোহান্ত বাবাজীদের ন্যায়) 'স্বামীজি'রাও সেই ভিক্ষুকের দলের অর্জ্জনের (ভিক্ষা এবং ছবি ও সমাজ-বিরুদ্ধমতখ্যাপক পুস্তকাদি ফেরি করিয়া যাহা হয় তাহার) দ্বারা বেশ বড় লোক মাফিক চলাফেরা করিতেছেন, তখন মনে হয়—এই ব্যবসায় চলিতেছে মন্দ নয়! নচেৎ কোথায় কবে দুর্ভিক্ষ প্লাবন বা মহামারী হইবে—তারজন্য এইরূপ করিয়া দল বাঁধিয়া রাখার প্রয়োজনই বা কি ছিল? চন্দ্রদত্ত বাবু ইহাও লিখিয়াছেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের জন্মগ্রামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইলে, দেখিয়া তিনি সুখী হইবেন। তাঁহার উপদেশ অবশ্যই মূল্যবান্। তবে যতটা জানিতে পারিয়াছি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রামের সামাজিক অবস্থা এখনও এমন পরস্পর সহানুভূতিশূন্য হয় নাই যে, 'সেবাশ্রম' একটা করা নিতান্তই আবশ্যক। বরং এরূপ 'সেবাশ্রম' যে স্থানে আবির্ভূত হইবে, সেখানে লোক ক্রমশঃ পরার্থপরতা ভুলিয়া যাইবে। বিলাতের লোক যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া 'পুয়র হাউস' দেখাইয়া দেয়—এখানেও হয় তো লোকে আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে সেরূপ সেবাশ্রম

---

* বঙ্কিম বাবুর আনন্দ মঠ পড়িলে, নানা বিষয়ে আধুনিক এই মঠের সাদৃশ্য মনে হইবে; বঙ্কিম বাবুও নাকি বাস্তবের উপরেই কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

† ইহারা অনেকেই সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবক; বিবাহ করিয়া সমাজে থাকিলে সদ্‌গৃহস্থের সংখ্যা বাড়িত, ইহাতে ক্রমশঃ ক্ষীণভূত হিন্দু সমাজের ও লাভ হইত।

দেখাইয়া দিবে। *

চন্দ্রদত্ত বাবু বলিয়াছেন—"নদীয়ার প্রেমাবতার একবার ছেঁড়া পুথির উপর ঘা দিয়াছিলেন। তাহাতে আযবন চণ্ডাল উন্নত হইয়াছে।" এই "ছেঁড়া পুথি"র অর্থ অবশ্যই শাস্ত্র গ্রন্থ—এবং এইরূপ উক্তি স্বামীজির সাধু অনুকরণ সন্দেহ নাই—সাধে কি পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিবেকানন্দের প্রতি বিরাগবান্? শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রের উপর আঘাত দেওয়া দূরে থাকুক তিনি স্বয়ং অগাধ শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন; তাঁহার শিক্ষানুসারে রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া গিয়াছেন। এমনকি চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থেও পদে পদে শাস্ত্রের বচন উদ্ধারপূর্ব্বক তত্ত্ব বিচার আছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী সেইসব প্রভুপাদিগণও এক একজন প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন। ইদানীং গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পরীক্ষায় বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্রেরও মর্য্যাদা লাভ হইয়াছে।

ফলতঃ যাঁহারা এযুগেও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া প্রখ্যাত (যেমন রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি) তাঁহারাও শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তবে কেশব চন্দ্র সেন (যিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না) ইঁহাতেই শাস্ত্রমর্য্যাদার লোপ হইয়াছে—ফলও তেমনি হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন বেশ জমকাল হইয়াছিল—এখন নিষ্প্রভ প্রায়। স্বামীজি ব্রাহ্মসমাজেরই মেম্বর ছিলেন—তিনি ঐ ধারাই ধরিয়াছিলেন। ভূত দেখিয়া যদি ভবিষ্যৎ বিচার করিতে হয়, তবে পরিণাম কি হইবে তদীয় সম্প্রদায় বুঝিয়া লউন। †

---

* ইতোমধ্যেই জানিতেছি অনাথ আতুরদের আত্মীয় স্বজন কেহ কেহ নাকি উহাদিগকে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিতেছে। ঐ সকল নিরুপায় ব্যক্তিকে জীবনের এই চরমকালে আজন্ম পোষিত সংস্কার (অন্নগ্রহণে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার) সেবাশ্রমে গিয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

† পরমহংসদেব সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না—তিনি গুরুমুখে ও সাধুসঙ্গে শাস্ত্রমর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার একটা "সম্প্রদায়" হউক এমনটা যেন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না—প্রকৃত পক্ষে ইহা স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রবর্ত্তিত। তথাপি পরমহংসদেব গুরু (এবং অবতার) বলিয়া—ইহা তাঁহার 'সম্প্রদায়' রূপেই প্রায়শঃ কথিত হইয়া থাকে।

বড় বড় 'কথা' আমরা বহু শুনিয়াছি ও শুনিতেছি; কিন্তু কথায় লোকের চিঁড়া ভিজে না। কথা যিনি বলিবেন, তাঁহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেখিবেন তাঁহার চরিত্র ও অনুষ্ঠানাদি কথার অনুরূপ কিনা। এই জন্যই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক স্বামীজির কার্য্যে ও কথায়, অনুষ্ঠানে ও উপদেশে সামঞ্জস্য কতদূর তাহা পরীক্ষা করিবার বিষয়—বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাই করিয়াছেন—এবং বেশ নিরপেক্ষভাবেই করিয়াছেন। যদি গলদ থাকে তাহা ঘাটিতে হইবেই—বরং সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের উচিত ঐসব যথাসম্ভব দূর করা, সমালোচককে গালি মাত্র দিয়া কোনও লাভ নাই। "চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না"—"প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়" এইরূপ উপদেশ দেওয়া বা খ্যাপন করা খুবই সহজ—কিন্তু কাজের বেলায় কি দেখিতে পাই?—দেখি আগাগোড়া 'চালাকি' (যথা চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে পরমহংসদেবের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি ছলনা মাত্র এইরূপ বলা); দেখি "প্রেমের" পরিবর্ত্তে গালি, (যেমন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর বর্ষিত হইয়াছে); দেখি "সত্যানুরাগের" পরিবর্ত্তে অত্যুক্তিবাদ ও অপ্রমাণিত কথা (যথা স্বামীজির বিশেষণাদি—এবং চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক পরমহংসদেবের শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ ইত্যাদি); এবং দেখি "মহাবীর্য্যের" পরিবর্ত্তে অভিনয় ও অভদ্রতা (যেমন প্রতিবাদ প্রবন্ধের 'টোন্' ও বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব)!!

উপসংহারে বর্ম্মা মহাশয়ের প্রতি এই দীনের বিনীত নিবেদন এই যে, তদীয় প্রবন্ধে যে 'মহাত্মা'র এবং 'প্রেমাবতারের' উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাদের শিক্ষায় তিনি অনুপ্রাণিত হউন; তাঁহাদের সারল্য, সহিষ্ণুতা, অনাড়ম্বর ও পবিত্রতা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করুন; এবং কৃপা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখকের ধৃষ্টতা যেন তিনি মার্জ্জনা করেন।

হিতবাদী বলেন—"আলোচনা চতুষ্টয়"—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয় প্রণীত। এই গ্রন্থখানি ৺ কাশীধামের ব্রাহ্মণ সভা হইতে প্রকাশিত সমাজহিতকর গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক। আলোচনাচতুষ্টয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত চারিটী প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" ও "ঘরে বাইরে", দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সীতা," তৃতীয় প্রবন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" ও চতুর্থ প্রবন্ধে যোগীন্দ্রনাথ বসুর "পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী" গ্রন্থের স্থানবিশেষের আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ চারিটী সমালোচনা হইলেও ইহাতে হিন্দু সমাজের ও এই সমাজে চির-প্রচলিত আর্য্য সভ্যতার মর্ম্ম কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। আমরা হিন্দু মাত্রকেই বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত কলেজের ছাত্র সম্প্রদায়কে এই আলোচনা চতুষ্টয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কালপ্রভাবে হিন্দুর সমাজ-দেহে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়া সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পঙ্গু করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই পুস্তকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ❀ ❀ ❀

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্পষ্টবাদী তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তিনি নিজে নৈষ্ঠিক হিন্দু। হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা। সেই চেষ্টা এই পুস্তকে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচারে দেশের ও সমাজের উন্নতি হইবে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নায়ক বলেন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "আলোচনা চতুষ্টয়" নামক পুস্তক আমরা পড়িয়া দেখিলাম। আলোচনা ভালই হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র আলোচনা গ্রন্থকার যেরূপ নির্ভীকভাবে করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহাদের দোষ বা ত্রুটিকে দোষ-ত্রুটি বলিবার সাহস এদেশে অনেকেরই নাই। এরূপ ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহাশয় সত্য কথা বলিয়া অনেকের জ্ঞান-চক্ষুঃ যে খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' পুস্তকের যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাও পাণ্ডিত্য ও স্পষ্টবাদিতার পরিচায়ক। পুস্তকখানির প্রধান গুণ এই যে, তিনি হিন্দু আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। আশা করি, হিন্দুসমাজ তাঁহার গ্রন্থের আদর করিবেন।